৪

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। মৌর্য সাম্রাজ্যই ভারতের ইতিহাসে প্রথম সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য। আদি কৌম সমাজ রূপান্তরিত হয় সাম্রাজ্যে। মৌর্য সম্রাটরা বহু-বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বংশের দুজন সম্রাট– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোক - বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাজ্য বিজয়, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মৌর্য সম্রাটগণ অতুলনীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এরপর খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে কুষাণ সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। কুষাণদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক।

খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে গড়ে উঠেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্য। গুপ্ত বংশের দুজন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত – বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। সুষ্ঠু শাসন, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুপ্তযুগে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তযুগকে যথার্থই প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুষ্যভূতি বংশের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে সমগ্র উত্তর ভারতে। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন। তাঁর কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সাম্রাজ্যসমূহের আলোচনা থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় ইতিহাসের মূলধারার সাথে পরিচিতি ঘটবে।

উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যসমূহের ঘাত-প্রতিঘাত বাংলার ভূভাগেও অনুভূত হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে গুপ্ত শাসন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত-পূর্ব যুগে বাংলার নিজস্ব অস্তিত্ব তেমন একটা বিকাশের সুযোগ পায়নি। তবে গুপ্ত শাসনাধীনে বাংলার ইতিহাস এই বিকাশের চিহ্ন বহন করে। অষ্টম পাঠে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গুপ্তোত্তর যুগে সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার সম্রাট শশাঙ্কের রাজত্বকাল বাংলার স্বকীয় সত্তার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি শশাঙ্কের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে নবম পাঠে।

উত্তর ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার ইতিহাস এই ইউনিটের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. মৌর্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- পাঠ-২. মহামতি অশোকপাঠ-৪. বাংলার ইতিহাসের উৎস ঃ প্রাচীন ও সুলতানি যুগ।
- পাঠ-৩. কুষাণ সাম্রাজ্য ঃ কণিষ্ক
- পাঠ-৪. গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
- পাঠ-৫. সমুদ্রগুপ্ত
- পাঠ-৬. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
- পাঠ-৭. গুপ্তযুগের গৌরব
- পাঠ-৮. বাংলায় গুপ্ত শাসন
- পাঠ-৯. শশাঙ্ক
- পাঠ-১০. হর্ষবর্ধন।

পাঠ - ১

মৌর্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি

- মৌর্য সাম্রাজ্যের উদ্ভবের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনী ও রাজ্য বিজয় বর্ণনা করতে পারবেন ;
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে আলেকজান্ডারের মৃত্যু ঘটলে তাঁর অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলে গ্রিকদের মধ্যে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং বিরোধ দেখা দেয়। এ সময়ে মগধে নন্দবংশীয় সম্রাট ধননন্দ রাজত্ব করছিলেন। তিনি মোটেও জনপ্রিয় ছিলেন না। এ অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন দখল করেন এবং উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করে ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত।ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনারূপে বর্ণনা করেছেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হিন্দু সাহিত্যিক উপাদানের সাক্ষ্যানুসারে তিনি ছিলেন নন্দ বংশোদ্ভূত। তাঁর মায়ের নাম ছিল মূরা এবং তিনি ছিলেন এক নন্দ রাজার পত্নী বা উপ-পত্নী। অনেকে মনে করেন যে মাতা মূরার নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় মৌর্য। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মূরার পুত্র হবে 'মৌরেয়', মৌর্য নয়। মধ্যযুগীয় শিলালিপিতে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ লেখকদের মতানুসারে, মৌর্যরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। গৌতম বুদ্ধের আমলে তাঁরা পিপ্পলিবন নামক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের শাসক ছিলেন। মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে 'বৃষল' বলা হয়েছে যা থেকে অনেকেই মনে করেন যে তিনি শূদ্র ছিলেন। তবে মনে রাখা দরকার যে 'বৃষল' শব্দটি শুধু শূদ্রকেই বোঝায় না। এ শব্দটির অন্য দুটি অর্থ হচ্ছে রাজ-শ্রেষ্ঠ এবং জাতিচ্যুত। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রিক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন এবং শেষ জীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য জাতিচ্যুত হিসাবে তাঁকে 'বৃষল' বলা যেতে পারে। অন্যদিকে বিশাল সাম্রাজ্য এবং সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাজ-শ্রেষ্ট হিসাবেও 'বৃষল' রূপে আখ্যায়িত হতে পারেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন ময়ূর-পোষক এক গ্রাম-প্রধানের দৌহিত্র। বৌদ্ধ উৎসগুলো মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছে। মহাবংশে তাঁকে মৌর্য নামের ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দিব্যাবদানেও বিন্দুসার ও অশোককে ক্ষত্রিয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে মৌর্যদের পিপ্পলিবনের শাসকগোষ্ঠীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত উৎসগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ উৎসগুলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং এ কারণে পন্ডিতরা মনে করেন যে, মৌর্যরা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের আমলে মৌর্যরা ছিলেন পিপ্পলিবনের শাসকগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে পিপ্পলিবন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে মৌর্যরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতা অন্তঃসত্তা অবস্থায় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্ম হয়। এক রাখাল চন্দ্রগুপ্তকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাঁকে নিকটবর্তী এক গ্রামে নিয়ে যায়। কিংবদন্তী অনুসারে বাল্যকালে তিনি গো-পালক ও শিকারীদের মাঝে বড় হয়ে ওঠেন। সেখান থেকে কৌটিল্য নামে তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত তাঁকে তক্ষশীলায় নিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা দান করেন। প্লুটার্ক ও জাস্টিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় চন্দ্রগুপ্ত মগধের অত্যাচারী নন্দরাজা ধননন্দকে উৎখাত করার জন্য আলেকজান্ডারকে আমন্ত্রণ জানাতে পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের শিবিরে গিয়েছিলেন। তাঁর এহেন আচরণকে ডঃ রায়চৌধুরী রাণা সংগ্রাম সিংহের বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আলেকজান্ডার চন্দ্রগুপ্তের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁর মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিলে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসেন। তখন থেকেই চন্দ্রগুপ্ত ভারত থেকে গ্রিক ও নন্দদের উৎখাত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

ভারত থেকে গ্রিক-বিতাড়ন ও নন্দ-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ পন্ডিত কৌটিল্যের সাহায্যে পেয়েছিলেন। আর্থিক সাহায্যের আশায় কৌটিল্য পাটলিপুত্রে এসে নন্দরাজার কাছে অপমানিত হয়েছিলেন বলে তিনিও নন্দদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন অথবা গ্রিকদের বিতাড়িত করেছিলেন সে বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গ্রিক ঐতিহাসিক জাস্টিনের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাটলিপুত্র দখল করেন এবং পরে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন। ডঃ রায়চৌধুরী এবং ভিনসেন্ট স্মিথ এ মতকে সমর্থন করেন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে গ্রিকদের পরাজিত করার পর মগধ-রাজ ধননন্দকে সিংহাসনচ্যুত করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে পাটলিপুত্র অধিকার করেন এবং পরে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন, এ মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনারোহণের তারিখ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গ্রিক উৎস থেকে জানা যায় যে, ৩২৬ অথবা ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে তখনো তিনি রাজা হননি। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের নির্বাণলাভের ১৬২ বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন। ক্যান্টনের দিনপঞ্জি অনুসারে বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল ৪৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর ১৬২ বছরের পরের সালটি হয়(৪৮৭-১৬২)=৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরই চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়েছিলেন বলে সবাই মনে করেন। কাজেই ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। অন্যদিকে দীপবংশ থেকে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর ২১৮ বছর পর অশোকের অভিষেক হয়েছিল (৪৮৭-২১৮)= ২৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর চার বছর আগেই তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পুরাণের সাক্ষ্যানুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত এবং বিন্দুসার যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কাজেই চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন (২৭৩+৪৯)=৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ তারিখ অধিকাংশ আধুনিক পন্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন।

মগধের সিংহাসন দখল ও গ্রিকদের বিতাড়ণে সমকালীন পরিস্থিতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহায়ক হয়েছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরপরই ভারতে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে গ্রিক গভর্নরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সিন্ধুর গভর্নর সঙ্গে সংঘর্ষে পাঞ্জাবের গভর্নর পিথন নিহত হন। এর কিছুদিন পরে তক্ষশীলায় কৌটিল্যের নেতৃত্বে গ্রিক-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সময় আততায়ীর হাতে পুরু নিহত হলে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সে অঞ্চল থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করা সহজ হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ মগধের রাজা ধননন্দ ছিলেন অত্যাচারী। জনগণ তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রগুপ্ত এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নন্দদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। তৃতীয়তঃ এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসাবে তুলে ধরেন। একদিকে বিদেশী শাসনের অবসান এবং অন্যদিকে অত্যাচারী শাসকের উচ্ছেদ উভয় লক্ষ্যেই তিনি জনগণের সাহায্য লাভ করেছিলেন।

পাটলিপুত্র দখলের উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রথম দুটি সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এর পর চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যের সাহায্যে মগধ সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকা থেকে অভিযান শুরু করেন এবং রাজধানী পাটলিপুত্র অধিকার করতে সক্ষম হন। নন্দ সেনাপতি ভদ্রশাল বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে বাধা দিয়ে পরাজিত হন। পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখলের পর চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদেরও বিতাড়িত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন একজন বিজয়ী বীর। ক্ষমতা লাভের পর তিনি ভারতের এক বিশাল অংশ জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্লুটার্ক বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রায় সমগ্র ভারত দখল করেছিলেন। জাস্টিনও বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন 'ভারতের মালিক'। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্রও জয় করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দাক্ষিণাত্য বিজয় নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত নয়, দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন তাঁর ছেলে বিন্দুসার। ভিনসেন্ট স্মিথ এ মতের প্রবক্তা। তিনি বলেছেন যে সাধারণ অবস্থা থেকে সিংহাসন দখল, গ্রিকদের বিতাড়ন, পশ্চিম ভারত জয়, সেলুকাসকে পরাজিত করা- এত কিছু করার পর চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সুদূর দাক্ষিণাত্য জয় করা সম্ভব ছিল না। বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন এ মতের সমর্থনে তিনি বিন্দুসার ষোলটি রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন- তারনাথের এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পন্ডিতই স্মিথের এ মত গ্রহণ করেন নি। বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন– এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, বিন্দুসারের পক্ষে দাক্ষিণাত্য জয় করা সম্ভব ছিল না। কোনো উৎসেই বিন্দুসারের দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া বিন্দুসার যোদ্ধাসুলভ কোনো গুণেরও অধিকারী ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি নিজে বিদ্রোহ দমন করতে না গিয়ে তাঁর ছেলে অশোককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। যে রাজা নিজের রাজ্যের এক অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে যাননি, তিনি পর্বতাকীর্ণ দুর্গম দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া গ্রিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিন্দুসার ডুমুর ও মিষ্টি মদ পছন্দ করতেন এবং দরবারে বসে পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। এ হেন চরিত্রের বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করবেন এটা ভাবা যায়না।

ড. রায়চৌধুরী মনে করেন যে, মৌর্যদের দাক্ষিণাত্য জয় করার কোনো প্রয়োজনই ছিলনা। তিনি বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্য ছিল নন্দদের সাম্রাজ্যভুক্ত। কাজেই নন্দ রাজাকে পরাজিত করে পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখল করার সাথে সাথে নন্দ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই দাক্ষিণাত্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ মতের স্বপক্ষে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে নও-নন্দ-দেহরা নামে একটি শহরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এ শহরের অস্তিত্ব থেকে তিনি মনে করেন যে, দাক্ষিণাত্যের একটা বিরাট অঞ্চল নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও নন্দদের বিপুল ধন-সম্পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে দাক্ষিণাত্য কিছুকালের জন্য নন্দদের অধিকারে থাকলেও এমনও হতে পারে যে নন্দদের শাসনকালে বা তাঁদের পতনের পর সে এলাকা স্বাধীন হয়ে যায়। এ কারণেই মৌর্যদের জন্য নতুন করে দাক্ষিণাত্য জয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ড. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার বলেছেন যে, একজন প্রাচীন তামিল গ্রন্থকার মৌর্যদের তিনেভেলী জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তবে চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ না করে তিনি এ রাজাকে 'মৌর্যভূঁইফোড়' বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে মনে করা যায় যে, সাধারণ অবস্থা থেকে সিংহাসনে উন্নীত প্রথম মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তকেই বোঝানো হয়েছে।

মহীশুরে প্রাপ্ত কিছু শিলালিপিতে উত্তর মহীশুরে চন্দ্রগুপ্তের শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, শিকারপুর তালুকের অন্তর্গত নাগরখন্ড চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীনে ছিল। মুদ্রারাক্ষসেও চন্দ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য অধিকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাজেই প্লুটার্ক ও জাস্টিনের বর্ণনা, তামিল সাহিত্য এবং মহীশুরে প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্য বিবেচনা করলে মনে হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন।

জৈন কাহিনীগুলোতেও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যোগাযোগের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে হরিষেণের বৃহৎ-কথা, কোষ রত্নানন্দের ভদ্রবাহু-চরিত এবং রাজাবলীকথার উল্লেখ করা যায়। ঐ সব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করে একদল জৈন ভিক্ষুর সঙ্গে ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং জৈন বিধিমতে অনাহারে মহীশুরের শ্রাবণবেলাগোলায় দেহত্যাগ করেন। সবকিছু বিবেচনা করে আধুনিক পন্ডিতরা মনে করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে পশ্চিম ভারতও জয় করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র তাঁর শাসনাধীন ছিল। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের ১৫০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ জুনাগড় প্রস্তরলিপিতে সৌরাষ্ট্রে চন্দ্রগুপ্তের 'রাষ্ট্রীয়' পুষ্যগুপ্ত কর্তৃক বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ খননের উল্লেখ রয়েছে।

রাজত্বের শেষ ভাগে সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটে। সেলুকাস ছিলেন আলেকজান্ডারের একজন সেনাপতি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়লে সেলুকাস প্রথমে ব্যাবিলন ও পরে সিরিয়া দখল করেন। এরপর তিনি ভারতে অভিযান পরিচালনা করে আলেকজান্ডারের বিজিত অঞ্চলগুলো দখল করার চেষ্টা করেন। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণে সেলুকাসের সিন্ধু নদী অতিক্রম ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। জাস্টিন চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা বলেছেন। প্লুটার্ক বলেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি উপহার দিয়েছিলেন। স্ট্র্যাবো এ বন্ধুত্বের ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের অধিকৃত চারটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দানের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে গ্রিক লেখকদের বিবরণে সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের মৌর্যের যুদ্ধের কোনো বিবরণ নেই। তাঁরা শুধু বন্ধুত্ব স্থাপন ও সন্ধির শর্তাবলীর উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যে এই অভিযানে সেলুকাস সাফল্য লাভ করতে পারেননি এবং সে কারণেই তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সেলুকাস তাঁর কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন একথা স্মিথ স্বীকার করেন না। কিন্তু ড. রায়চৌধুরী মনে করেন যে জামাতাকে যৌতুক হিসাবেই সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে চারটি প্রদেশ দিয়েছিলেন।এ প্রদেশ চারটি ছিল হিরাট, কান্দাহার, মাকরান এবং বেলুচিস্থান। উত্তর পশ্চিমের এসব এলাকা যে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তা অশোকের শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত। বন্ধুত্বের এ সম্পর্কের সূত্রেই সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে দূত হিসাবে মেগাস্থিনিসকে পাঠিয়েছিলেন। গ্রিকদের সঙ্গে মৌর্যদের এ কূটনৈতিক সম্পর্ক পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।

জৈনগ্রন্থ রাজাবলীকথা অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাজত্বের শেষদিকে উত্তর ভারতে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। মনে হয় এ সময়ই তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মহীশুরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগোলায় জৈন বিধি অনুসরণ করে তিনি অনাহারে দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ২৪ বছর রাজত্বের পর তিনি ২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুধু দক্ষ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সফল প্রশাসকও। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি একটি সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।তাঁর শাসনব্যবস্থা সর্ম্পকে জানার অনেকগুলো উৎস রয়েছে। তাঁর প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং অশোকের শিলালিপিগুলো এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।তাছাড়া মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রস্তরলিপি ও কিছু সাহিত্যিক রচনা থেকেও তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সর্ম্পকে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর রচয়িতা এবং রচনাকাল সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এটা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ১৫টি বিভাগ ও ১৮০টি উপবিভাগে বিভক্ত এ গ্রন্থে প্রায় ৬০০০ শ্লোক রয়েছে। ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। অর্থশাস্ত্র রাজনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা গ্রন্থ নয়। এটা প্রশাসকের জন্য সারগ্রন্থ। এতে সরকারের সমস্যাবলী এবং সরকারি প্রশাসনিক যন্ত্র ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সর্ম্পকে জানার গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের রচিত ইন্ডিকা। মূল গ্রন্থটি পাওয়া না গেলেও স্ট্র্যাবো, অ্যারিয়ান, ডিওডরাস-এর মত পরবর্তীকালের লেখকদের উদ্ধৃতি থেকে ইন্ডিকার বিষয়বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব। শোয়ানবেক এগুলো সংকলন করেছেন এবং ম্যাকক্রিন্ডল এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। প্রাচীনকালে মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকাকে নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হতো, যেমনটি করেছেন অ্যারিয়ান। তিনি মেগাস্থিনিসকে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু স্ট্রাবো মেগাস্থিনিসের

পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে নিদারুণ বিরক্ত হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্লিনির চোখেও তিনি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হননি। বিদেশী পর্যটকদের কিছু সহজাত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁর ইন্ডিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে বিবেচিত। অনেকক্ষেত্রেই ইন্ডিকার বিবরণ অর্থশাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত। অশোক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তন করলেও মূল কাঠামো মোটামুটি আগের মতই ছিল বলে মনে হয়। সে হিসেবে অশোকের লিপিমালা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে বিবেচিত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক - এই দু ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় তিনটি অংশ ছিল যথা– রাজা, অমাত্য ও সচিব এবং মন্ত্রীপরিষদ।

রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। মৌর্য রাজারা নিজেদের 'দেবতাদের প্রিয়' রূপে অভিহিত করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের সম্পদের মালিকানা এবং বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব ছিল তাঁর ক্ষমতার উৎস। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজাকে কিছু প্রাচীন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। রাজা প্রজাদের তাঁর সন্তান বলে মনে করতেন। প্রজার মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর কর্তব্য। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা ছিল এবং রাজধানীতে এবং প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে কয়েকজন মন্ত্রী থাকতেন যাদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজা তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর সামরিক, বিচার বিষয়ক, আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্ষমতা ছিল। সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা করে তিনি যুদ্ধ-পরিকল্পনা তৈরি করতেন। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকতেন। বিচারকাজ সম্পাদনের জন্য তিনি দরবারে বসতেন। স্ট্রাবো বলেছেন যে প্রয়োজন হলে তিনি ব্যক্তিগত আরাম- আয়েশ ত্যাগ করে সারাদিনই দরবারে বিচার কাজে কাটাতেন। দরবারে বিচার কাজে বসলে কৌটিল্য রাজাকে বিচারপ্রার্থীকে অপেক্ষমান না রাখতে বা অন্যের ওপর দায়িত্ব না দিতে সাবধান করে দিয়েছেন। কারণ, এতে জনমনে অসন্তোষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হতে পারে যা রাজার বিপদ ডেকে আনতে পারে।

রাজার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই যে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজাকে 'ধর্মপ্রবর্তক' বা আইন প্রণেতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে 'রাজ-শাসন' বা রাজকীয় অনুশাসন ছিল আইনের উৎস। অশোকের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রাজকীয় অধ্যাদেশগুলো হচ্ছে রাজকীয় অনুশাসনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আইন প্রণয়নে তিনি 'পুরাণ-প্রকৃতি' অর্থাৎ পুরাতন রীতি-নীতি মেনে চলতেন। প্রহরী নিয়োগ, রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা,মন্ত্রী, পুরোহিত ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ,মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে আলোচনা, গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ এবং বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা জানানো ইত্যাদি ছিল রাজার নির্বাহী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যশাসনের মূলনীতিগুলো রাজা নিজেই ঠিক করতেন। সে মোতাবেক তিনি জনগণ ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ পাঠাতেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজা দূরবর্তী এলাকার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন।

কৌটিল্য বলেছেন যে এক চাকায় গাড়ী চলেনা - অর্থাৎ রাজার একার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁর সহযোগিতা প্রয়োজন। কৌটিল্যের উলে-খিত সচিব বা অমাত্যকেই মেগাস্থিনিস সপ্তম জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা রাজাকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতেন। তাঁদের সংখ্যা কম হলেও গুর"ত্ব ছিল অনেক।

সচিব বা অমাত্যদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাদের বলা হতো 'মন্ত্রিণ' বা 'মহামন্ত্রী'। অশোকের শিলালিপিতে উল্লেখিত মহামাত্রগণই সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের আমলে 'মন্ত্রিণ' বা 'মহামন্ত্রী'নামে অভিহিত হতেন। তাঁদের বার্ষিক বেতন ছিল ৪৮০০০পাণ (রৌপ্যমুদ্রা)। শাসন সম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে রাজা তিন-চারজন মন্ত্রিণের সঙ্গে আলোচনা করতেন। জরুরি অবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে মন্ত্রিণগণকেও ডাকা হতো। মন্ত্রিণরা রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। যুবরাজদের ওপরেও তাঁদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কৌটিল্যও এমনি একজন মন্ত্রিণ ছিলেন। মন্ত্রিণদের সংখ্যা ছিল একাধিক।

মন্ত্রিণগণ ছাড়াও মন্ত্রীপরিষদ নামে একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে এই পরিষদের অবস্থান অশোকের শিলালিপি থেকে প্রমাণিত। মন্ত্রিণদের তুলনায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের স্থান ছিল নিচে। এই পরিষদের সদস্যদের বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র ১২০০০ পাণ। জরুরি পরিস্থিতি এবং শাসন সংক্রান্ত জটিল কাজের সময় রাজা এই পরিষদের পরামর্শ নিতেন। মন্ত্রিপরিষদের মতামত গ্রহণ করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিলনা। তবে কৌটিল্যের মত ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অবহেলা করাও রাজার পক্ষে সহজ ছিলনা। মন্ত্রীপরিষদ শাসনকাজে রাজাকে সাহায্য করতেন। প্রদেশপাল, উপরাজ্যপাল, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি,বিচারক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতো। বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানানোর সময়ও তাঁরা রাজার সঙ্গে দরবারে উপস্থিত থাকতেন।

মন্ত্রিণ ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ ছাড়াও তৃতীয় এক শ্রেণীর অমাত্য শাসন ও বিচার বিভাগের উঁচু পদগুলোতে নিযুক্ত ছিলেন।বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা নিযুক্ত পেতেন।এদের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারক, সমাহর্ত্রী (রাজস্ব আদায় বিভাগের কর্মকর্তা) সন্নিধাত্রী(কোষাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ও প্রমোদ-উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য পদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিতের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তিনি ছিলেন রাজার ধর্মীয় বিষয়ে উপদেষ্টা। রাজদ্রোহের অপরাধেও তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যেতো না। পুরোহিতের পরে স্থান ছিল যুবরাজের। তিনি কার্য-নির্বাহী বিভাগের অন্তর্গত কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, অথবা সাধারণভাবে শাসনকাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতেন তা স্পষ্ট নয়। সেনাপতি ছিলেন সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তবে তিনি সেনা-প্রধান না যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন তা বলা কঠিন। রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন প্রতিহার।

বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন অধ্যক্ষগণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নগরাধ্যক্ষ (নগর), বলাধ্যক্ষ (সেনাবিভাগ), সুতাধ্যক্ষ (কৃষি), সূত্রাধ্যক্ষ (বয়ন), শুল্কাধ্যক্ষ (শুল্ক) ইত্যাদি।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সামরিক বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে জানা যায়।তাঁর সেনাবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও হস্তি আরোহী সৈন্য ছিল।এছাড়া তাঁর একটি নৌ-বাহিনীও ছিল। ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের ওপর ন্যস্ত ছিল সামরিক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব।এই পরিষদ আবার পাঁচজন সদস্য নিয়ে ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বোর্ড একটি নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল যথা: পদাতিক, অশ্বারোহী, যুদ্ধ-রথ, হস্তিবাহিনী, খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহণ এবং নৌ-বাহিনী।

রাজধানী পাটলিপুত্রের পরিচালনার ভার ছিল সামরিক পরিষদের মত একটি নগর পরিষদের ওপর। এই পরিষদও প্রতি বোর্ডে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বোর্ড একটি নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল যথা, শিল্পোৎপাদন, বিদেশী নাগরিক, জন্ম -মৃত্যু,খুচরা ব্যবসায়,ওজন ও মাপ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি, এবং বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রিত মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে আদায়। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে শুধুমাত্র পাটলিপুত্র নগরের পরিচালনা-ব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রধান নগর তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী ইত্যাদিতেও অনুরূপ পৌরসংগঠন ছিল বলে মনে করা ভুল হবেনা।

রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক। দরবারে বসে তিনি বিচার করতেন। এ ছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলেও বিচারালয় ছিল। শহরে বিচার করতেন মহামাত্রগণ এবং গ্রামাঞ্চলে বিচার করতেন রাজুকগণ। গ্রিক লেখকদের বিবরণে বিদেশীদের জন্য পৃথক বিচারকের কথা পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে ধর্মীয়-দেওয়ানি আদালতকে 'ধর্মস্থির' এবং ফৌজদারি আদালতকে 'কন্টকশোধন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মেগাস্থিনিস এবং কৌটিল্য দুজনই ফৌজদারি আইনের বিশেষ কঠোরতার কথা বলেছেন। জরিমানা ছিল সাধারণ অপরাধের শাস্তি। বড় ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গচ্ছেদ ও শিরচ্ছেদ। অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য

বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করা হতো। দন্ডবিধির কঠোরতার কারণে দেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল কম। গ্রিক লেখকরা বলেছেন যে চুরির ঘটনা ছিল বিরল। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সংবাদ, কর্মচারীদের কার্যকলাপ এবং প্রজাদের মনোভাব জানার জন্য বহু গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো। স্ট্র্যাবোর মতানুসারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ করা হত। অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরদের সংস্থা: এবং সঞ্চারা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট স্থানে থাকত তাঁরা সংস্থা: নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে গৃহী, ব্যবসায়ী এবং সন্ন্যাসীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক স্থান থেকে স্থানান্তরে সঞ্চরণরতদের বলা হত সঞ্চারা: এ দলে থাকতো ভিক্ষুকী সাপুড়ে,পরিব্রাজিকা, গণিকা এবং নর্তকী। স্ট্র্যাবো এবং কৌটিল্য, দুজনের বর্ণনাতেই গুপ্তচর বৃত্তিতে বহু সংখ্যক মহিলা নিয়োগের উল্লেখ রয়েছে।

সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-কর। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত দুধরনের কর ছিল- ভাগ এবং বলি। জমিতে উৎপন্ন ফসলের এক অংশ রাজাকে দিতে হতো যা ভাগ নামে পরিচিত। সাধারণত এর পরিমাণ ছিল এক-ষষ্ঠাংশ। তবে প্রয়োজনে এটা এক-চতুর্থাংশে উন্নীত বা এক অষ্টমাংশে হ্রাস করা হতো। বলি ছিল অতিরিক্ত কর। জমি জরিপ এবং সেচ-ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হতো। শহরাঞ্চলে রাজস্ব-আয়ের প্রধান উৎস ছিল জন্ম-মৃত্যু কর,জরিমানা, বিক্রিত দ্রব্যের ওপর কর ইত্যাদি। গণিকা, পানশালা, জুয়ার আড্ডা ইত্যাদি থেকেও রাজ্যের আয় হতো।

বিশাল সাম্রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়ও ছিল বিশাল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর জন্য বহু অর্থ ব্যয় হতো। বেসামরিক প্রশাসনের ব্যয়ও ছিল বিরাট। রাজকীয় কারখানায় নিয়োজিত কারিগরদের সরকারি কোষাগার থেকে বেতন দেওয়া হতো।জঙ্গল পরিষ্কার ও বন্যপ্রাণী হত্যার জন্য পশুপলক ও শিকারীদের ভাতা দেওয়া হতো।ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা রাজকোষ থেকে অর্থলাভ করতেন।জলসেচ,পথঘাট নির্মাণ,বিশ্রামাগার ও হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি জনহিতকর কাজেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতো। শিল্পসৌধ নির্মান এবং সংরক্ষণ, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কাজেও অর্থব্যয় করা হতো। গরীব দু:খীকে সাহায্য দান এবং দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশা মোচনেও সরকারি অর্থ ব্যয় করা হতো।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিলনা। তাই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যেকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। রাজা শাসন করতেন কেন্দ্রে আর তাঁর প্রিয় ব্যক্তি প্রদেশপাল হিসাবে প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁর সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য কয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। অশোকের শিলালিপিতে উত্তরাপথ, অবন্তীরথ, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ এবং প্রাচ্য- এই পাঁচটি প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। এগুলোর রাজধানী ছিল যথাক্রমে তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তোসালী এবং পাটলিপুত্র। কলিঙ্গ অবশ্য বিজিত হয়েছিল অশোকের আমলে বাকি চারটি প্রদেশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে সাধারণত রাজকুমারদের প্রদেশপাল হিসাবে নিয়োগ কর হতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হতে জানা যায় যে 'কুমার' উপাধিকারী এ সব প্রদেশপালের বার্ষিক বেতন ছিল ১২০০০ পাণ। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচ্য প্রদেশটি ছিল সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। এই প্রদেশের শাসনকাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে মহামাত্র নিয়োগ করেন।

প্রদেশগুলো কতগুলো জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদের শাসন পরিচালনা করতেন সমাহর্ত্রী। জনপদের এক-চতুর্থাংশের শাসনভার ছিল স্থানিক নামক কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত। প্রদেষ্ট্রি নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল সমাহর্ত্রীর ভ্রাম্যমাণ সহকারী। পাঁচ থেকে দশটি গ্রামের শাসনভার ছিল গোপ নামক কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত। প্রতি গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামিক উপাধিকারী একজন কর্মচারীকে নির্বাচিত করতেন যার ওপর গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত ছিল।

জৈন কাহিনী অনুসারে রাজত্বের শেষভাগে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুকে অনুসরণ করে মহীশুরে চলে যান। মহীশুরের অর্ন্তগত শ্রাবণবেলগোলায় ২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জৈন বিধি অনুসারে অনাহারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রাণত্যাগ করেন।

সারসংক্ষেপ

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হলে ভারতে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে গ্রিক গভর্নরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ সময়ে মগধে নন্দবংশীয় সম্রাট ধননন্দ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জনগণ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। অত:পর তিনি গ্রিকদের বিতাড়িত করে ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে তিনি তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ পন্ডিত কৌটিল্যের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুধু দক্ষ যোদ্ধা ও বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি একজন সফল প্রশাসকও ছিলেন। অধীনস্ত সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি একটি সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন, যা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক– এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজাকে কিছু প্রাচীন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হতো। জৈন কাহিনী অনুসারে রাজত্বের শেষভাগে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল জৈন ভিক্ষুর সাথে মহীশুরে চলে যান।২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শ্রাবণবেলগোলায় জৈন বিধি অনুসারে অনাহারে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন–

(ক) সমুদ্রগুপ্ত (খ) সেলুকাস

(গ) চন্দ্রগুপ্ত (ঘ) কৌটিল্য।

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন–

(ক) ক্ষত্রিয় (খ) শূদ্র

(গ) বৌদ্ধ (ঘ) ব্রাহ্মণ।

৩। মৌর্যদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন–

(ক) পুষ্যগুপ্ত (খ) চন্দ্রগুপ্ত

(গ) অশোক (ঘ) বিন্দুসার

৪। সুদর্শন হ্রদ খনন করেছিলেন–

(ক) অশোক (খ) পুষ্যগুপ্ত

(গ) বিন্দুসার (ঘ) রুদ্রদামন।

৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মারা যান–

(ক) পাঞ্জাবে (খ) বিহারে

(গ) কলিঙ্গে (ঘ) মহীশুরে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন?

২। চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যের সাথে সেলুকাসের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

৩। কৌটিল্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৪। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয়সহ রাজ্যবিজয়ের বিবরণ দিন।

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করুন।

৩। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People,* Vol-II, *The Age of Imperial Unity.*

২। হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

৩। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১ম খন্ড।

৪। V.A. Smith, *The Oxford History of India.*

৫। R.K. Mookherji, *Candragupta Maurya and His Times.*

পাঠ - ২

মহামতি অশোক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- অশোকের রাজত্বকালের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- অশোকের ধর্মের বিবরণ দিতে পারবেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনের বসেন। তিনি প্রায় ২৫ বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের ৪ বছর পর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। এই বিলম্বের কারণে অনেকে মনে করেন যে সিংহাসন নিয়ে তাঁর ভাইদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলেছিল। তবে কোন উৎসে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। সিংহলি ইতিবৃত্ত দীপবংশ হতে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগের ২১৪ বছর পরে অশোক সিংহাসনে বসেছিলেন এবং সিংহাসনে বসার ৪ বছর পর তাঁর অভিষেক হয়েছিল। সাধারণভাবে গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগের তারিখ ৪৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। কাজেই অশোক (৪৮৭-২১৪) ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তাঁর অভিষেক হয়েছিল ২৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

সিংহাসনে আরোহণ করে অশোক তাঁর পূর্বসুরীদের মতই 'দেবনম পিয়' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে 'দেবনম পিয় পিয় দসী' রূপে পরিচয় দিতেন। অশোক নামটি সাহিত্যে এবং মাত্র দুটি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। অশোক রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন এবং স্বভাবতই যুবরাজসুলভ আমোদপ্রমোদ, মৃগয়া, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি ভালোবাসতেন। পিতার রাজত্বকালে অশোক প্রথম জীবনে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। পরে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে বিন্দুসার তাঁকে সেখানে পাঠান। বিদ্রোহ দমনের পর তিনি তক্ষশীলার শাসনভার গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ২৭৩ খ্রিস্টপুর্বাব্দে তিনি পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজত্বের প্রথম ১৩ বছর অশোক পূর্বসুরী মৌর্যদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও ভারতের বাইরে বিদেশী শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের সনাতন নীতি অনুসরণ করেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ ও জয় করেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উড়িষ্যা ও গঞ্জাম জেলার কিছু অংশ নিয়ে কলিঙ্গ রাজ্য গঠিত ছিল। অশোকের শিলালিপিতে তাঁর কলিঙ্গ আক্রমণের কারণ পাওয়া যায়না। বিভিন্ন পন্ডিত বিভিন্নভাবে এ আক্রমণের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ড. রায়চৌধুরী মনে করেন যে, কলিঙ্গ নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও নন্দদের পতনের পর কলিঙ্গ স্বাধীন হয়ে যায়। প্লিনির বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালেই কলিঙ্গ ছিল স্বাধীন রাজ্য। কাজেই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ ও জয় করেছিলেন। তিব্বতীয় বিবরণ থেকে জানা যায় যে জলপথ বা স্থলপথে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথে কলিঙ্গ ছিল বাধাস্বরূপ। কাজেই কলিঙ্গ জয় করা অশোকের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক রোমিলা থাপার এটাকেই কলিঙ্গ আক্রমণের মূল কারণ বলে মনে করেন। তাছাড়া কলিঙ্গ ছিল তখন এক শক্তিশালী রাজ্য। প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্তের আমলে কলিঙ্গের ৬০ হাজার পদাতিক, ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৭ শত রণহস্তি ছিল। অশোকের আমলে এ সামরিক শক্তি নিশ্চিতভাবেই আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ রকম একটি শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন অশোকের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ড. ভান্ডারকারের মতে, বিন্দুসারের আমলে কলিঙ্গ দক্ষিণের চোল ও পান্ড্য রাজাদের সঙ্গে জোট বেধে তাঁর বিরুদ্ধে বাধা দিয়েছিল। অশোক দেখেন যে মগধের অধীনস্থ অস্ত্র, উত্তরে কলিঙ্গ ও দক্ষিণে চোল ও পান্ড্যদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এ কারণেই তিনি কলিঙ্গ

আক্রমণ করেছিলেন। তাছাড়া বাণিজ্যিক স্বার্থও অশোককে কলিঙ্গ জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মগধের বাণিজ্য তখন তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের পথে ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা এবং জাভা পর্যন্ত চলতো। কলিঙ্গ ছিল মগধের এই সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই কলিঙ্গকে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করতে অশোক উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

কলিঙ্গ বিজয়ের পর এটা মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এ যুদ্ধে ১১/২ লক্ষ লোক বন্দী, ১ লক্ষ লোক নিহত এবং বহু সংখ্যক লোক আহত হয়।এ যুদ্ধে শুধু কলিঙ্গের সৈন্যরাই নিহত হয়নি। কলিঙ্গের সাধারণ অধিবাসীরাও আহত-নিহত হয়েছিল।নতুন এ প্রদেশের রাজধানী হয় তোসালী এবং একজন রাজকুমারকে এর শাসনভার দেওয়া হয়।নতুন প্রদেশের প্রশাসনিক নীতি ঘোষণা করে অশোক মহামাত্রদের উদ্দেশ্যে দুটি অধ্যাদেশ জারি করেন।এ অধ্যাদেশ দুটিতেই সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন যে "সব মানুষই আমার সন্তান"।

ড. রায়চৌধুরীর মতে, কলিঙ্গ বিজয় ছিল "মগধ ও ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য জয় করে মগধের রাজ্যজয় ও বিস্তারের যে সূচনা করেছিলেন কলিঙ্গ বিজয় তাঁর সমাপ্তি সূচনা করে। এটা এক নতুন যুগের সূচনা করে- যে যুগ ছিল শান্তি, সামাজিক প্রগতি, ধর্মপ্রচার এবং একই সাথে রাজনৈতিক স্থবিরতা এবং সম্ভবত সামরিক অকার্যকারিতার যখন অনুশীলনের অভাবে মগধের সামরিক তেজস্বিতা অবলুপ্ত হয়ে যায়। সামরিক বিজয় বা দিগ্বিজয়ের যুগের অবসান ঘটে, ধম্মবিজয় বা আধ্যাত্মিক বিজয়ের যুগের সূচনা হয়।"

কলিঙ্গযুদ্ধ অশোকের মন ও শাসননীতির ওপরেও গভীর প্রভাব ফেলে। এ যুদ্ধের পর অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থমতে তিনি উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অশোকের মনের পরিবর্তন তাঁর ধর্মমতের পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি-মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতেও প্রভাব ফেলেছিল।

অশোক তাঁর সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ করবেন না। ধর্ম বিজয় অর্থাৎ সৌহার্দ্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে অপরের প্রীতি অর্জনই শ্রেষ্ঠ বিজয়। সামরিক বিজয়কে প্রকৃত বিজয় বলে মনে না করে ধর্ম বিজয়কেই প্রকৃত বিজয় বলে মনেপ্রাণে তিনি গ্রহণ করেছেন। মৌর্য সম্রাটদের চিরাচরিত দিগ্বিজয় নীতি তিনি পরিত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র, প্রপৌত্র কেউই ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ করবে না বলেও তিনি ঘোষণা করেন। তিনি ভারতের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে তাঁর ধর্মনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে লোক পাঠান। তিনি তাঁর মৈত্রী নীতি দ্বারা ভারতের কেরল, চোল, পান্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলোর সৌহার্দ্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতের বাইরে তিনি সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া, ইপিরাস, সিংহল প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদেরও প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

অশোক রাজ-কর্তব্যের এক নতুন আদর্শ প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সব মানুষই তাঁর সন্তান। তাদের জাগতিক ও পারলৌকিক সুখ নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রজাদের জাগতিক কল্যাণের জন্য তিনি শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুবিচার ইত্যাদির অবস্থা দেখার জন্য তিনি 'রাজুক', 'সুত' প্রভৃতি কর্মচারীদের তিন ও পাঁচ বছর পর পর রাজ্য পরিক্রমায় পাঠাতেন। অশোক আইনের চোখে সকলকে সমান বিবেচনা করতেন। তিনি সকলের জন্য সম-অপরাধের জন্য সম-পরিমাণ শাস্তির বিধান করে 'ব্যবহার-সমতা' এবং 'দন্ড-সমতা' নীতির প্রবর্তন করেন।

মানুষ ও পশুর জন্য তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পাশে ছায়াবান গাছ রোপন ও কূপ খনন করেছিলেন। রাজকর্মচারীরা যাতে কর্তব্যে অবহেলা না করে সেদিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি ধর্মমহামাত্র নামের এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন যাদের কাজ ছিল প্রজাদের

আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করা। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, জৈন ও আজীবিক সম্প্রদায়কে নানা রকম দানে সম্মানিত করতেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলেই ভারতবর্ষের এক বিশাল এলাকায় মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। অশোক কলিঙ্গ জয় করলে তার আরো বিস্তৃতি ঘটে। দেশী-বিদেশী লেখকদের বিবরণ এবং অশোকের শিলালিপিগুলোর অবস্থান থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। কলিঙ্গের ধোলিতে এবং অন্ধ্রের জৌগড় গ্রামে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। উত্তর-পূর্বে লুম্বিনী ও নিগ্লীভ স্তম্ভলিপি থেকে বোঝা যায় যে, নেপালের তরাই অঞ্চল ছিল অশোকের রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমা। দেরাদুন জেলার কালসী গ্রামে অশোকের শিলালিপি-প্রাপ্তি হিমালয় অঞ্চলে তাঁর রাজ্য-সীমা নির্দেশ করে। পাকিস্তানের হাজারা জেলার মানসেরা গ্রামে এবং পেশোয়ার জেলার শাহবাজ গরহি গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে তাঁর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। গ্রিকসূত্র থেকে জানা যায় যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আফগানিস্তানের জালালাবাদে এবং গান্ধারের তক্ষশীলায় অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে সেলুকাসের কাছ থেকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তান লাভ করেছিলেন তাঁর সমর্থন পাওয়া যায়। কাশ্মির যে অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হিউয়েন সাং এর বিবরণ ও কল্‌হণের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায়।

জুনাগড়ে প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি কাথিয়াওয়াড়ে মৌর্য প্রভুত্বের সাক্ষ্যবহন করে। মহারাষ্ট্রের সোপারাতে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই এলাকা যে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তা অবশ্য পরবর্তীকালের শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি থেকেও জানা যায়।

দক্ষিণে অন্ধ্র প্রদেশের এরাগুড়িতে এবং মহীশুরের চিতলদ্রুগ জেলায় অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ থেকে বলা যায় যে, দক্ষিণে অশোকের সাম্রাজ্য ঐ দুটি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলার মহাস্থানগড়ে ব্রাহ্মী হরফে লেখা শিলালিপি পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্ত বন্দরে ও কর্ণসুবর্ণে অশোক নির্মিত স্তুপের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্বভাবতই বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা যায়। তবে কামরূপ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলেই মনে করা যায়।

শিলালিপি, স্থাপত্য নিদর্শন ও বিভিন্ন লেখক ও পরিব্রাজকদের বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, পূর্বে কামরূপ এবং দক্ষিণে কয়েকটি তামিল রাজ্য ছাড়া গোটা ভারতবর্ষের ওপর অশোকের শাসন কর্তৃত্ব ছিল। ভারতের বাইরে আফগানিস্তানের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে সম্রাট অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কল্‌হণের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় যে, প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন শিবের উপাসক। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মনে পরিবর্তন আনে এবং তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অশোক যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাঁর লিপিমালা ও অন্যান্য উৎস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

১ম অপ্রধান প্রস্তরলিপিতে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর আসক্তির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করেছেন। মাস্কি ও রূপনাথ লিপিতে নিজেকে তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা করেছেন। ১ম অপ্রধান প্রস্তরলিপিতে উল্লেখ আছে যে, তিনি দুবছরের বেশি সময় যাবৎ উপাসক হয়েছেন। কিন্তু এক বছর তিনি ধর্মের ব্যাপারে তেমন উদ্যম প্রকাশ করেননি। কিন্তু সংঘের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর থেকে প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি যথেষ্ট উদ্যমের সঙ্গে ধর্মপালন করছেন। এ সংঘ যে বৌদ্ধ সংঘ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারক লিপিতে তাঁকে বৌদ্ধ সংঘের ওপর কর্তৃত্বের সুরে কথা বলতে দেখা যায়। সেখানে তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিক্ষু ও সাধারণ উপাসকদের জন্য ধর্মগ্রন্থের বিশেষ কিছু অংশ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ লিপিতে তিনি বৌদ্ধ ত্রিত্বে (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছেন।

সারনাথ, কৌশাম্বী এবং সাঁচীর অপ্রধান স্তম্ভলিপিতে তাঁকে ধর্মরক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। এ সব লিপিতে তিনি মহামাত্রদের বিভেদ সৃষ্টিকারী ভিক্ষু বা ভিক্ষুনীদের সংঘ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন।

অষ্টম প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি বিহার যাত্রাকে ধর্মযাত্রায় পরিণত করেছিলেন। প্রথমে তিনি বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের জন্ম ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত তীর্থস্থানগুলো ভ্রমণ করেন। রুমিন্দী স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, অভিষেকের বিংশতিতম বছরে তিনি এখানে এসে প্রার্থনা করেছিলেন এবং এ স্থান গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান হওয়ায় এখানে পাথরের দেওয়াল ও স্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এ স্তম্ভলিপি থেকে আরো জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি হওয়ার কারণে তিনি লুম্বিনী গ্রামের অধিবাসীদের সব রকম ধর্মীয় কর থেকে মুক্তি দান করেন এবং ভূমি-রাজস্ব এক-অষ্টমাংশে হ্রাস করেন।

বৌদ্ধ সংঘের সংহতি বজায় রাখার জন্য অশোক বৌদ্ধ সম্মেলন বা সঙ্গীতি আহ্বান করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের সপ্তদশ বছরে পাটলিপুত্রে এ সম্মেলন হয়েছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ দূর এবং গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাবলীর সংকলন করা ছিল এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। মোগলিপুত্ত এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো সারনাথ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করা হয়।

অশোকের কোনো কোনো লিপিতে হাতির প্রতিকৃতি বা গজোত্তম কথাটি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে গৌতম বুদ্ধ জন্মের আগে হাতির আকারে তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন। এ থেকে মনে হয় যে অশোক তাঁর এ লিপিগুলো বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে ব্যক্তিগত জীবনে অশোক বৌদ্ধ ছিলেন।

অশোক নিজে বৌদ্ধ হলেও তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের প্রকৃতি নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন যে অশোকের প্রচারিত ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। আবার অনেকেই এটাকে বৌদ্ধ ধর্ম বলে মনে করেন না।

অশোকের প্রচারিত ধর্মমতকে ফ্লিট বৌদ্ধ ধর্ম বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে এটা ছিল 'রাজধর্ম'- অর্থাৎ রাজাদের পালনীয় আচরণবিধি। কিন্তু এটা ঠিক বলে মনে হয় না। রাজা বা রাজর্কচারীদের পালনীয় আচরণবিধি এটা ছিল না- এটা ছিল সৎ জীবনযাপনের জন্য সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত কিছু নিয়ম।

ম্যাকফাইলের মতে এটা বৌদ্ধ ধর্ম ছিল না, এটা ছিল সরল ধার্মিকতা যা অশোক তাঁর প্রজা সাধারণকে অনুশীলন করতে বলেছিলেন। ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন যে, সেকালে দেশে প্রচলিত কোনো ধর্ম হিসাবে একে চিহ্নিত করা উচিৎ নয়; নিশ্চিতভাবেই এটা বৌদ্ধ ধর্ম ছিল না। ড. ভিনসেন্ট স্মিথও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁর মতে অশোকের ধর্মে তেমন কোন স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাঁর ধর্মের নীতিমালা ভারতীয় প্রায় সব ধর্মেই ছিল।

ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আরো বলেছেন যে অশোকের প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম ছিল না কারণ এতে বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষাবলীর কোন উল্লেখ নেই; এতে চার আর্য-সত্য, কার্য-কারণ সম্পর্ক, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা নির্বাণ তত্ত্ব অনুপস্থিত।

অশোকের ধর্মে শুধু নৈতিক তত্ত্বই রয়েছে এমন নয়, এতে এগুলো অনুশীলনের পন্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধদের মত অশোকের ধর্মের লক্ষ নির্বাণ ছিলনা। দ্বাদশ প্রস্তরলিপি থেকে মনে হয় যে অশোকের ধর্ম কোন নির্দিষ্ট ধর্ম নয়। এটা ছিল কতকগুলো নৈতিক অনুশাসন- যাকে সকল ধর্মের সারকথা বা নির্যাস বলা

চলে। রিস ডেভিডের মতে অশোকের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট ধর্মমত নয়- এটি সহজ, সরল ও সৎজীবন যাপন করার জন্য একটি নীতিমালা।

অশোকের ধর্মে দেবতা ও স্বর্গের উল্লেখ রয়েছে। তিনি নিজেকে দেবতাদের প্রিয়রূপে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ বৌদ্ধ ধর্মে দেবতা বা স্বর্গের কোনো স্থান নেই।

ডি.ডি. কোশাম্বী মনে করেন যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাত দূর করা ছিল অশোকের এই ধর্মের লক্ষ। এ যুগে কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল যার ফলে গৃহপতি, শ্রেষ্ঠী ও বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এই পরিবর্তনকে রোধ করতে পারেনি। তাই শ্রেণী-সংঘাত এড়াতে অশোক তাঁর ধর্মপ্রচার করে রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।

অধ্যাপক রোমিলা থাপার বলেছেন যে, মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল ঘোরতর কেন্দ্র-প্রবণ। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য এই কেন্দ্র-প্রবণতার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ এড়াবার জন্যই অশোক তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ছিল ব্যবহারোপযোগী ও সুবিধাজনক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর সকল প্রজার কাছেই এটা ছিল একটা গ্রহণযোগ্য নীতিমালা এবং এর দ্বারা তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন।

অশোকের ধর্ম ছিল সার্বজনীন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্মের চেয়ে অধিকতর উদার ও মানবধর্মী ছিল। কাজেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এটা ছিল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

তদানীন্তন প্রচলিত অনেক ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে অশোকের প্রচারিত ধর্মের বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল। তবে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতির সঙ্গে পার্থক্য থাকায় পন্ডিতরা মনে করেন যে, অশোকের প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম ছিল না।

অশোক তাঁর ধর্মের শিক্ষাবলী প্রচারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মের বাণী সারা সাম্রাজ্য জুড়ে স্তম্ভ ও প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল বিষয় ছিল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবে দয়া, সত্যবাদিতা ইত্যাদি।

অশোক তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি, রাজকীয় দান ও জনহিতকর কাজ পরিচালনা এবং অশোকের ধর্মের শিক্ষাবলী প্রচার করাই ছিল ধর্মমহামাত্রদের কাজ।তিনি সুত, রাজুক প্রভৃতি কর্মচারীদের জনগণের কাছে তাঁর ধর্মের বাণী প্রচারের নির্দেশ দান করেন।

অশোক নিজেও তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রচার করার ফলে প্রজাদের মধ্যে তাঁর ধর্ম সহজেই প্রসার লাভ করে।

তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ, রাস্তার পাশে ছায়াবান বৃক্ষরোপন এবং ধর্মশালা স্থাপন করেন। ৭ম স্তম্ভলিপিতে তিনি বলেছেন যে তিনি ধর্মমাত্র নিয়োগ ও ধর্মস্তম্ভ স্থাপন করেছেন। ধর্মস্তম্ভ দ্বারা সম্ভবত তিনি এ সব জনহিতকর কাজকেই বুঝিয়েছিলেন।

অশোকের ধর্মপ্রচার শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের বাইরেও তাঁর প্রচারকরা বিভিন্ন দেশে তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। ত্রয়োদশ লিপিতে অশোক বলেছেন যে, তাঁর ধর্মের বাণী পাঁচটি গ্রিক শাসিত রাজ্য যথা সিরিয়া, মিশর, কাইরেনী, ম্যাসিডন এবং ইপিরাসে বিস্তার লাভ করেছিল। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কন্যা সংঘমিত্রা ও পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। সিংহলী ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, অশোক ব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রায়ও ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করার পর ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অশোক মৃত্যুবরণ করেন। তিব্বতীয় কাহিনী অনুসারে সম্রাট অশোক তক্ষশীলায় দেহত্যাগ করেন। তবে এ কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে অনেক পন্ডিতই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র এবং বিম্বিসারের পুত্র অশোক ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর পূর্বসুরীদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণনীতি অনুসরণ করেন এবং রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে কলিঙ্গ আক্রমণ করে জয় করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রচুর মানুষ হতাহত হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা অশোকের মন ও শাসননীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মৌর্য সম্রাটদের চিরাচরিত দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যাগ করে ঘোষণা করেন তাঁর পুত্র, প্রপৌত্র কেউই ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ করবে না। সামরিক বিজয়ের পরিবর্তে ধর্ম বিজয় অর্থাৎ সৌহার্দ্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে অপরের প্রীতি অর্জনকেই প্রকৃত বিজয় বলে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন সব মানুষই তাঁর সন্তান। তাদের জাগতিক ও পারলৌকিক সুখ নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতির সঙ্গে পার্থক্যের দরুন পন্ডিতরা মনে করেন যে, অশোকের প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ছিল না। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল বিষয় ছিল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবে দয়া, সত্যবাদিতা ইত্যাদি। ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাইরে তাঁর ধর্মনীতি প্রচারের জন্য তিনি লোক পাঠান। এই সার্বজনীন ধর্ম তথা মৈত্রী নীতি অনেকে সাদরে গ্রহণ করেন। প্রায় ৪০ বছর রাজত্বের পর ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহামতি অশোক মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. অশোকের অভিষেক অনুষ্ঠান হয় তাঁর সিংহাসনারোহণের-
   (ক) পাঁচ (খ) চার
   (গ) আট (ঘ) ছয় বছর পর।

২. প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন-
   (ক) কলিঙ্গ (খ) উজ্জয়িনী
   (গ) সৌরাষ্ট্র (ঘ) মহীশুরের শাসনকর্তা।

৩. অশোক জয় করেন-
   (ক) সৌরাষ্ট্র (খ) মহীশুর
   (গ) কলিঙ্গ (ঘ) সিন্ধু

৪. অশোক মৃত্যুবরণ করেন-
   (ক) ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (খ) ২৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে
   (গ) ২৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (ঘ) ২১৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। অশোক সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২। প্রজাদের জাগতিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধনে অশোক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। অশোকের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। কলিঙ্গ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

৩। অশোক কি বৌদ্ধ ছিলেন? তাঁর প্রচারিত ধর্ম কি বৌদ্ধধর্ম ছিল?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People,* Vol-II, *The Age of Imperial Unity.*

২। D.R. Bhandarkar, *Asoka.*

৩। R.C. Majumdar, H.C. Raychowdhury, K.K. Datta, *An Advanced History of India.*

৪। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস।*

৫। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা।*

পাঠ - ৩

কুষাণ সাম্রাজ্য : কণিষ্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কুষাণদের ইতিহাসের উপাদানগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন ;
- কুষাণ জাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান বর্ণনা করতে পারবেন ;
- কণিষ্কের সময়কাল নির্ধারণ করতে পারবেন ;
- কণিষ্কের রাজ্যজয়ের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- কণিষ্কের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন ;
- কুষাণ যুগের শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মের বিবরণ দিতে পারবেন।

যে সকল বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে কুষাণরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কুষাণ বংশ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

অন্যান্য বিদেশী জাতির তুলনায় কুষাণদের ইতিহাসের উপাদানের পরিমাণ বেশি। সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো এক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। কুষাণ বংশের ইতিহাস রচনার জন্য চীনা ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। চীনা উৎসে পাওয়া তথ্য ও সন, তারিখগুলো নির্ভরযোগ্য এবং মূল্যবান। চীনা গ্রন্থগুলোর মধ্যে পান-কু রচিত প্রথম হান বংশের ইতিহাস, ফ্যান-ই রচিত পরবর্তী হান বংশের ইতিহাস, মা-তোয়ান লিন রচিত বিশ্বকোষ এবং সু-মা-কিয়েন সংকলিত সি-চি (ঐতিহাসিক দলিল) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুষাণ রাজাদের প্রথম দিকের ইতিহাস, কুষাণদের আদিপরিচয়, ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে চীনা উৎসগুলোতে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যিক উৎসগুলোর মধ্যে কল্‌হণের রাজতরঙ্গিনী ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

কুষাণ যুগের ইতিহাস রচনার জন্য বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানও পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর মধ্যে লেখ বা লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে পাঞ্জতির লিপি, পেশোয়ার পেটিকা লিপি, মথুরা লিপি ইত্যাদি প্রধান। এগুলোর সাহায্যে কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের তারিখ ও রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করা যায়।

কুষাণ বংশের ইতিহাস রচনায় কুষাণ মুদ্রাগুলোও মূল্যবান। ড. রায়চৌধুরীর মতে কুষাণ যুগের কালপঞ্জি তৈরিতে কুষাণ মুদ্রা অত্যন্ত সহায়ক। তাছাড়া কুষাণদের মুদ্রা থেকে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কেও কুষাণ মুদ্রা থেকে ধারণা লাভ করা যায়।

কুষাণ যুগের স্তুপ, বিহার, প্রাসাদ, ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে সে যুগের স্থাপত্যশিল্প, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

চীনা ঐতিহাসিক সু-মা-কিয়েন ও পান-কুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কুষাণরা ছিল ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ-চি জাতি আদিতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পশ্চিম চীনের কান-সু প্রদেশের বাস করতো। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউ-চিরা হিউং-নু (হুণ) নামে এক উপজাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। এ সময় তাঁরা গোবি মরুভূমির উত্তরে চলে আসে এবং উ-সুন নামে এক উপজাতিকে

পরাজিত করে আরো পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায় এবং শিরদরিয়া নদীর উপত্যকায় উপস্থিত হয়। তাঁরা সেখান থেকে শকদের বিতাড়িত করে। শিরদরিয়া উপত্যকায় ইউ-চিরা বেশিদিন বসবাস করতে পারেনি। হুণদের সাহায্য নিয়ে উ-সুন উপজাতি তাঁদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ইউ-চিরা তখন আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আমুদরিয়া নদীর তীরে এসে সেখান থেকেও শকদের বিতাড়িত করে। পরে তাঁরা ব্যাক্ট্রিয়া দখল করে নেয়।

ব্যাক্ট্রিয়ায় বসবাসকালে ইউ-চিরা যাযাবর জীবন ত্যাগ করে এবং পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদেরই এক শাখা ছিল কুষাণ। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দ নাগাদ কুষাণ শাখার নেতা কুজলা কদফিসেস ইউ-চিদের পাঁচটি শাখাকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি কাবুল, পেশোয়ার, কাশ্মির অধিকার করেন। কুজলা কদফিসেসের পর তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস সিংহাসনে বসেন। বিম কদফিসেস তাঁর পিতার রাজ্য ব্যাক্ট্রিয়া সহ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মির লাভ করেন। পরে তিনি তক্ষশীলা ও পাঞ্জাব দখল করেন। বিম কদফিসেসের মুদ্রা থেকে জানা যায় যে তিনি কান্দাহার ও নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। বিম কদফিসেসের সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তাঁর মুদ্রায় 'মহেশ্বর' নাম এবং শিবমূর্তি, ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্ন উৎকীর্ণ দেখা যায় যা থেকে মনে করা যায় যে, বিম কদফিসেস শৈব ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর আমলে ভারতের সঙ্গে চীন ও রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। কুষাণ সাম্রাজ্য থেকে মশলা, রেশম, মণি-মুক্তা, হাতির দাঁত, চন্দন ইত্যাদি রপ্তানি হতো। বিনিময়ে রোম থেকে আসতো প্রচুর সোনা।

খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিম কদফিসেস যুদ্ধে চীনা সেনাপতি প্যান-চাওর কাছে পরাজিত হন এবং চীন সম্রাটকে বাৎসরিক করদানে বাধ্য হন।

বিম কদফিসেসের মুত্যুর পর কণিষ্ক সিংহাসনে বসেন। তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কণিষ্ক কদফিসেস রাজাদের পূর্বেই সিংহাসনে বসেছিলেন। বিম কদফিসেসের সঙ্গে কণিষ্কের সম্পর্ক কি ছিল তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি কদফিসেস রাজাদের পরেই সিংহাসনে বসেছিলেন বলে অধিকাংশ পন্ডিত মনে করেন। কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের তারিখ নিয়েও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ড. ফ্লিট মনে করেন যে, কণিষ্ক ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং একটি সম্বতের প্রচলন করেছিলেন যা পরবর্তীকালে বিক্রম সম্বৎ নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর এ মত গ্রহণ করলে বলতে হয় যে কণিষ্ক কদফিসেস রাজাদের আগে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, কণিষ্ক বিম কদফিসেসের পরে রাজত্ব করেছিলেন। কণিষ্ক সারনাথ অধিকার করেছিলেন। কদফিসেস কণিষ্কের পরবর্তী রাজা হলে তিনি শুধু গান্ধার অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলেন কেন? তক্ষশীলায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে কণিষ্ক গোষ্ঠীর রাজাদের মুদ্রা মাটির ওপরের স্তরে এবং কদফিসেস রাজাদের মুদ্রা মাটির নীচের স্তরে পাওয়া গেছে। এ থেকে বলা যায় যে, কদফিসেস রাজাদের পরে কণিষ্ক সিংহাসনের বসেছিলেন। কণিষ্কের মুদ্রায় সাসানীয় প্রভাবও দেখা যায় যার ফলে তাঁর সিংহাসনারোহণকে ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, সাসানীয়রা ছিলেন অনেক পরবর্তীকালের। অ্যালানের মতে, কণিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা রোমান মুদ্রা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুতরাং কণিষ্কের রাজত্বকালকে রোম সম্রাট টিটাস (৭৭-৮১ খ্রি:) এবং ট্রাজানের (৯৮-১১৭ খ্রি:) আগে স্থান দেওয়া অনুচিত বলে মনে হয়। শিলালিপি, মুদ্রা এবং হিউয়েন সাং- এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, গান্ধার ছিল কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চীনা সাক্ষ্য অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধার ছিল শক শাসনাধীন। কদফিসেস রাজাদের মুদ্রায় শক মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়। ফলে মনে করা যায় যে ঐ অঞ্চলে শক শাসনের পরেই তাঁরা শাসন করেছিলেন।

মার্শাল, স্টেনকোনো, স্মিথ প্রমুখ পন্ডিত মনে করেন যে, কণিষ্ক ১২৫-১২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর রাজত্ব শুরু করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী এ মতের বিরুদ্ধে দুটি জোরালো আপত্তি তুলেছেন। প্রথমত, সুইবিহার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে নিম্নসিন্ধু উপত্যকার কিছু অংশ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অন্যদিকে শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা তাঁর শাসনাধীন ছিল। রুদ্রদামন ছিলেন স্বাধীন নরপতি। কুষাণদের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। রুদ্রদামনের রাজত্বকাল (১৩০-১৫০ খ্রি:) নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কাজেই কণিষ্কের রাজত্বকাল খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশকে নির্ধারণ করলে একই অঞ্চলে একই সময়ে দুজন রাজার শাসন দেখা যায়- যা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব। রুদ্রদামনের সময়কাল নিশ্চিত হওয়ায় মনে করা যায় যে, কণিষ্ক ১২৫-১২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে বসেননি।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ভারতীয় শিলালিপিতে দ্বিতীয় কদফিসেসের পরবর্তী কুষাণ সম্রাটদের তারিখ সম্বলিত নাম পাওয়া গেছে যেমন কণিষ্ক (১-২৩), বসিষ্ক (২০-২৮), হুবিষ্ক (২৬-৬০), দ্বিতীয় কণিষ্ক (৪১) এবং বাসুদেব (৬৭-৯৮)। এই তারিখগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে কণিষ্ক একটা অব্দের প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোনো অব্দ প্রচলিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, কণিষ্ক যে অব্দের প্রচলন করেছিলেন সেটি ছিল ২৪৮-২৪৯ খ্রিস্টাব্দের ত্রৈকুটক-কলচুরি-চেদি অব্দ এবং তিনি ঐ সময়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর এমতও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের প্রায় একশ' বছর পরে প্রথম বাসুদেবের রাজত্বকাল শেষ হয়েছিল। একাধিক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মথুরা বাসুদেবের শাসনাধীন ছিল। তাছাড়া সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে গুপ্তবংশের আগে মথুরা নাগবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। অর্থাৎ খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এ অঞ্চল ছিল নাগদের শাসনাধীন। কাজেই বাসুদেবের রাজত্বকাল খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেষ হয়েছিল একথা বলা যায় না। সুতরাং কণিষ্কের রাজত্বকাল খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয়েছিল একথাও গ্রহণযোগ্য নয়।

দীর্ঘকাল আগে ফার্গুসন মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনের বসেন এবং এ বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর অব্দ বা সম্বৎ চালু করেন। পরবর্তীকালে ওল্ডেনবার্গ, টমসন, ড. রায় চৌধুরী, ড. ডি.সি. সরকার, ড. বি.এন. মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পন্ডিত এ মত সমর্থন করেন।

কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং শকাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন এ মতের বিরুদ্ধে অধ্যাপক দুব্রেইল কয়েকটি আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু ড. রায়চৌধুরী যুক্তি দিয়ে সফলভাবে যেসব আপত্তিগুলো খন্ডন করেছেন।

দুব্রেইল বলছেন যে আমরা যদি স্বীকার করি যে প্রথম কদফিসেস ৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করছিলেন এবং কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব শুরু করেন, তবে প্রথম কদফিসেসের রাজত্বকালের অবসান এবং দ্বিতীয় কদফিসেসের সমগ্র রাজত্বকালের জন্য মাত্র ২৮ বছর সময় পাওয়া যায় যা তাঁর মতে খুবই সংক্ষিপ্ত। তবে এ সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত মনে হবেনা যদি আমরা মনে রাখি যে প্রথম কদফিসেস ৮০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন এবং ফলে দ্বিতীয় কদফিসেস বৃদ্ধ বয়সে রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকাল খুব দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়ত, দুব্রেইল তক্ষশীলায় মার্শাল আবিষ্কৃত ১৩৬ সম্বৎসরের দলিলের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিক্রম সম্বতের ১৩৬ সালকে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায় (১৩৬-৫৮) ৭৮ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর মতে, এ দলিলে যে রাজার উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ছিলেন প্রথম কদফিসেস, কণিষ্ক নন। এই দলিলে রাজার নামোল্লেখ না করে দেবপুত্র অভিধা ব্যবহার করায় দুব্রেইল মনে করেন যে, এই অভিধা দিয়ে কুষাণ রাজা প্রথম কদফিসেসকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ড. রায়চৌধুরী বলেছেন যে, দেবপুত্র অভিধাটি কণিষ্ক গোষ্ঠীর রাজাদের বৈশিষ্ট্য ছিল, কদফিসেস গোষ্ঠীর নয়। অনেকে মনে করেন যে, দেবপুত্র অভিধা প্রথম কদফিসেস প্রথমে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এতে ফার্গুসনের মত খন্ডিত হয় না। ড. রায়চৌধুরী যেমন বলেছেন যে, রাজার ব্যক্তিগত নামোল্লেখ না থাকার কারণে এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে প্রথম কুষাণ রাজাকেই বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি গুপ্ত শিলালিপিতে কুমারগুপ্ত এবং বুধগুপ্তের মত পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের শুধুমাত্র 'গুপ্ত নৃপ' রূপে উল্লেখিত হওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

কণিষ্ক প্রবর্তিত এই অব্দটি পরবর্তীকালে শকাব্দ নামে পরিচিত হয়। কোনো কোনো পন্ডিত এই মতের বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কণিষ্কই যদি এই অব্দের প্রবর্তক হয়ে থাকেন তবে এটা কণিষ্কাব্দ বা কুষাণাব্দ হিসাবে পরিচিত না হয়ে 'শকাব্দ' নামে পরিচিতি লাভ করে কেন? উল্লেখ করা যেতে পারে যে কণিষ্কের সময় এই অব্দটি শকাব্দ নামে পরিচিত ছিল না। পরবর্তীকালে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন শিলালিপিতে এটাকে শকাব্দ আখ্যা দেওয়া হয়। র‍্যাপসন বলেছেন যে, কণিষ্কের প্রবর্তিত অব্দটি পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপরা দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করেন। কুষাণদের পতনের পরেও তাঁরা এই অব্দটির প্রচলন অব্যাহত রাখেন। শকদের দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই এই অব্দের নাম হয় শকাব্দ।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তিনিই শকাব্দের প্রবর্তক।

কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারতের ইতিহাসে কুষাণ বংশের গুরুত্ব তাঁর কার্যকলাপের দ্বারাই অর্জিত হয়েছিল।

কণিষ্ক উত্তরাধিকারীসূত্রে দ্বিতীয় কদফিসেসের বিশাল সাম্রাজ্য পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও বহু রাজ্যজয় করে এর আরো বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। কল্হণের রাজতরঙ্গিনী এবং বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে কণিষ্ক কাশ্মির জয় করেছিলেন। কাশ্মিরে তিনি বহু সৌধ, স্তুপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন এবং কণিষ্কপুর নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শহরটি ধ্বংস হয়ে গেলেও সেখানে কণিষ্কপুর নামে একটি গ্রাম আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

কিংবদন্তী অনুসারে কণিষ্ক ভারতের অভ্যন্তরে হানা দিয়েছিলেন এবং পাটলিপুত্র আক্রমণ করেছিলেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে পাটলিপুত্র আক্রমণকালে বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষ তাঁর হাতে বন্দী হন এবং কণিষ্ক তাঁকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে আসেন।বৌদ্ধ পন্ডিত অশ্বঘোষ যে কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কণিষ্কের রাজসভায় অশ্বঘোষের উপস্থিতি থেকে কণিষ্কের মগধের কিয়দংশ জয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকেও কণিষ্কের পূর্ব ভারত জয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গোরখপুর ও গাজীপুরে কণিষ্কের বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত না থাকলে এখানে কণিষ্কের এত মুদ্রা পাওয়া যেত না।

কণিষ্ক উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত শক ক্ষত্রপ চস্তনকে পরাজিত করেছিলেন। এ যুদ্ধের ফলে কণিষ্ক শকদের কাছ থেকে মালবের কিছু অংশ লাভ করেছিলেন এবং শকরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল।ড. স্মিথের মতে, কণিষ্ক পহ্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সাফল্য লাভ করেছিলেন।

কণিষ্ক ভারতের বাইরেও তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।কণিষ্ক বর্তমান সোভিয়েত তুর্কিস্তানের কিছু অংশ, যথা কাশগড়, ইয়ারখন্দ এবং খোটান জয় করেছিলেন। সে আমলে এ স্থানগুলো চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় কদফিসেস প্যান-চাওর হাতে পরাজিত হয়ে চীন সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কণিষ্ক চীন সাম্রাজ্যভুক্ত এ সব অঞ্চল দখল করে পূর্বসুরীর অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের এক করদরাজ্যের রাজপুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ নিজ রাজসভায় নিয়ে এসেছিলেন। হিউয়েন সাং এর বিবরণে এর উল্লেখ রয়েছে।

ভারতের এক বিশাল এলাকা জুড়ে কণিষ্ক তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্ব ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য সারনাথ, বারাণসী, অযোধ্যা ও মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শিলালিপি থেকে এই অঞ্চলে কণিষ্কের অধিকার প্রমাণিত হয়। আরো পূর্বদিকে পাটলিপুত্র, পশ্চিম বাংলা, এমনকি উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলে কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন। তিনি বৌদ্ধ পন্ডিত অশ্বঘোষকে পাটলিপুত্র থেকে নিজ দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুষাণ মুদ্রা তমলুক, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদায় পাওয়া গেছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পশ্চিম ভারতের মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের শক ক্ষত্রপরা কণিষ্কের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। মধ্যভারত কণিষ্কে সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এখানে কণিষ্কের উত্তরাধিকারী বসিষ্কের লিপি পাওয়া গেছে। কাশ্মির যে কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তা কল্হণের

বর্ণনা থেকে জানা যায়। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গান্ধার তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল- পেশোয়ার লিপি, সুইবিহার লিপি ইত্যাদি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই বলা যায় যে ভারতে কণিষ্কের সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে পূর্বে পশ্চিম বাংলা এবং উত্তরে কাশ্মির থেকে দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়া ভারতের বাইরে বর্তমান সোভিয়েত তুর্কিস্তানের কিছু অংশ এবং আফগানিস্তানের কিছু অংশও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার। এখান থেকেই তিনি বিভিন্ন রাজকর্মচারীদের সাহায্যে তাঁর সাম্রাজ্য শাসন করতেন। কণিষ্ক নিজেকে 'দেবপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন যা থেকে মনে করা যায় তিনি রাজার দৈব অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। শাসনকাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল।

কুষাণ সম্রাটগণ প্রায়ই তাঁদের উত্তরাাধিকারীকে সহযোগী সম্রাটরূপে গণ্য করতেন। উত্তরাধিকার ভাবী সম্রাট শাসনকারী সম্রাটের জীবিতকালেই শাসনকাজে অংশগ্রহণ করতেন। এ কারণেই কণিষ্ক তাঁর অব্দের ২৩ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করলেও ঐ অব্দের ২০ বছরে উৎকীর্ণ তাঁর উত্তরাধিকারী বসিষ্কের লিপি পাওয়া যায়। বসিষ্ক সম্রাট হলে হুবিষ্ক তাঁর সহযোগী সম্রাটের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কণিষ্ক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে সেগুলো শাসন করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপগণ হতেন বংশানুক্রমিক। কণিষ্কের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর অধীনস্থ বহু ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপের নাম পাওয়া যায়।

কণিষ্কের একটি মন্ত্রীপরিষদ ছিল যার সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতো। মাথর ছিলেন কণিষ্কের প্রধানমন্ত্রী। শাসনব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর ছিল গ্রামিকের অধীনে গ্রাম। বিভিন্ন ধরনের 'গিল্ড' বা শ্রেণী বিভিন্ন পেশা ও ধর্মীয় দান সম্পর্কিত বিষয়ের দেখাশুনা করতো। অট্টালিকা নির্মাণের বা সংস্কারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপাধি ছিল 'নবকর্মিক'।

রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কণিষ্কের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। সেনাবাহিনী ছিল 'দন্ডনায়কের' অধীনে। তাঁরা প্রদেশ শাসনের ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহায্য করতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শাসনকাজে বহু কুষাণ, শক এবং গ্রিক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

শুধুমাত্র বিজেতা ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপেই নয়, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপেও কণিষ্ক ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন।কোনো কোনো পন্ডিতের মতে রাজত্বের শুরুতেই কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, কয়েক বছর রাজত্ব করার পর পাটলিপুত্র জয় করে অশ্বঘোষকে পেশোয়ারে নিয়ে আসার পর অশ্বঘোষের প্রভাবে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিউয়েন-সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে কণিষ্ক পেশোয়ারে একটি বহুতল চৈত্য ও একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। এই চৈত্য পরবর্তীকালে চৈনিক ও মুসলমান পর্যটকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কাঠের তৈরি চৈত্যটি ছিল ১৩ তল বিশিষ্ট এবং এর উচ্চতা ছিল ৪০০ ফুট। মঠটি খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে টিকে ছিল।

কণিষ্কের রাজত্বকালে শেষ বা চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।কোনো কোনো উৎস অনুসারে এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাশ্মিরে, আবার অন্য কোনো কোনো উৎস অনুসারে এটা হয়েছিল জলন্ধরে। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পান্ডুলিপি সংগ্রহ এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা ও টীকা তৈরি করা এবং বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরীণ মতভেদ দূর করাই ছিল এই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বৌদ্ধ পন্ডিত বসুমিত্র এবং অশ্বঘোষ ছিলেন এ সম্মেলনের সহ-সভাপতি। বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত পার্শ্ব ও অশ্বঘোষ ত্রিপিটক সম্পাদনা ও এর টীকা রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই ভাষ্য ও টীকা একটি তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করে স্তুপের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। তবে সেই স্তুপ বা তাম্রশাসন কোনোটিই পাওয়া যায়নি। কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্মমত 'মহাযান' ও 'হীনযান'-এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আগে বুদ্ধের কোনো মূর্তি বা প্রতিকৃতি তৈরি

করা হতো না এবং যারা প্রতীকের মাধ্যমে নিরাকার বুদ্ধের উপাসনা করতেন তারা হীনযান রূপে পরিচিত ছিলেন। মহাযান মতে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তির মাধ্যমে তাঁর উপাসনা শুরু হয়। হীনযানদের মতে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন একজন মানুষ, সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক। মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধকে দেবতার পর্যায়ে স্থাপন করে এবং তাঁর মূর্তিপূজা শুরু করে। চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে মহাযান মতবাদ গৃহীত হয়। কণিষ্ক শুধুমাত্র নিজেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ক্ষান্ত হননি। ভারতে ও ভারতের বাইরে এ ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এ জনপ্রিয়তা স্থায়ী হয়েছিল। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং ভারতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা লক্ষ করেছিলেন। কণিষ্ক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম তখন মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান ও কোরিয়ায় বিস্তার লাভ করেছিল।

কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি যে সহিষ্ণু ও উদার ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রায় গ্রিক, হিন্দু, জোরোষ্ট্রীয় প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি থেকে অনুমান করা যায়। কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁর মুদ্রায় গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতিও দেখা যায়। এমনও হতে পারে যে রাজনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে কণিষ্ক পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

কণিষ্ক শুধুমাত্র ধর্মানুরাগী ও বিজেতাই ছিলেন না। তিনি শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রমুখ বহু মনীষী তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। অশ্বঘোষ ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভা- পন্ডিত, কবি, সঙ্গীত ও শাস্ত্রবিদ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলী রচনা করেছিলেন। বুদ্ধচরিত হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি সূত্রালঙ্কার, মৌত্রানন্দ ও সারিপুত্রপ্রকরণও রচনা করেছিলেন। বুদ্ধচরিত গ্রন্থে অশ্বঘোষ অত্যন্ত সরলভাবে বৌদ্ধ ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। সারিপুত্রপুত্রপ্রকরণ একটি নাটক। সূত্রালঙ্কার সংস্কৃত উপাখ্যানের একটি সংকলন। অশ্বঘোষের রচনা প্রাচীন ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আগত চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ভারতবাসীকে অশ্বঘোষের রচনা বারংবার আবৃত্তি করতে দেখেছিলেন। পার্শ্ব ছিলেন এক বৌদ্ধ পন্ডিত। তিনি কণিষ্কের আমলে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বসুমিত্র এ সঙ্গীতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রবিদ। তিনি অভিধর্ম-প্রকর্ণ-পদ রচনা করেছিলেন। তৎকালীন ভারতের অন্য একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন নাগার্জুন। তিনি ছিলেন মহাযান বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যাকারী। নাগার্জুন শুধুমাত্র দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। তিনি রসায়ন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অনেকে তাঁকে মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্র শাস্ত্র রচনা করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিখ্যাত চরক ছিলেন কণিষ্কের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। চরক সংহিতায় এমন বহু উদ্ভিদ ও গাছের শিকড়ের নাম আছে যেগুলো থেকে ওষুধ তৈরি হতো। বিভিন্ন উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটিয়ে ওষুধ তৈরি করা হতো যা থেকে মনে হয় যে সেকালে ভারতবাসী রসায়নবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিল। শল্যবিদ্যায় দক্ষ শুশ্রুত ছিলেন কণিষ্কের আমলের অন্য একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। গ্রিক স্থপতি অ্যাজেসিলাস কণিষ্কের দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। তারই নির্দেশনায় পেশোয়ারের বিখ্যাত চৈত্য নির্মিত হয়েছিল।

কণিষ্ক শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। শিল্পের মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যই ছিল প্রধান। তাঁর আমলে বহু চৈত্য, মন্দির, স্তূপ ও নগর নির্মিত হয়েছিল। কণিষ্কের আমলে পেশোয়ারে বিখ্যাত চৈত্যটি নির্মিত হয়েছিল। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন গান্ধার অতিক্রম করার সময় মুক্তকণ্ঠে এই চৈত্যটির প্রশংসা করেছিলেন। কণিষ্ক মথুরাতে বহু সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। মথুরায় স্থানীয় ভাস্কররা বহু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। মথুরাতে কণিষ্কের মস্তকবিহীন মূর্তিও পাওয়া গেছে। ভাস্কর্য শিল্পে এ আমলে এক নতুন রীতির সৃষ্টি হয়। কুষাণ সাম্রাজ্যে বিভিন্ন দেশের শিল্পী ও কারিগরদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের (গান্ধার) ভারতীয় কারিগররা গ্রিক ও রোমানদের সংস্পর্শে এসেছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে এক নতুন ধরনের শৈল্পিক রীতি গড়ে ওঠে যা গান্ধার শিল্প রীতি নামে খ্যাত। এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধের উপাসনা মুর্তির মাধ্যমে করা হতো না। এ জন্য ব্যবহৃত হত বুদ্ধের পদচিহ্ন, স্তুপ অথবা বোধি বৃক্ষের প্রতীক। কিন্তু এখন বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ শুরু হয় এবং বৌদ্ধদের মধ্যে

মূর্তিপূজা শুরু হয়। এই বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করেই গান্ধার শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে গান্ধার শিল্প ছিল ভারতীয়, কিন্তু শিল্পরীতির দিক থেকে তা ছিল গ্রিক প্রভাবিত। ফলে এই রীতিতে নির্মিত বুদ্ধের মূর্তি দেখতে অনেকটা গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর মত। গান্ধার শিল্প সম্পর্কে বলা হয় যে ভাস্করের হৃদয় ছিল ভারতীয়, কিন্তু তার হাত দুটি ছিল গ্রিক।

কণিষ্কের ১-২৩ বছর পর্যন্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। ফলে মনে করা যায় যে, তিনি ২৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব শুরু করে ২৩ বছর রাজত্ব করার পর ১০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কণিষ্ক যে শুধু মাত্র কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন তাই নয়, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

সারসংক্ষেপ

যে সকল বিদেশি জাতি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে কুষাণদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুষাণ যুগের ইতিহাস রচনার জন্য বেশ কিছু সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস পাওয়া যায়। কুষাণরা ছিল ইউ-চি জাতির একটি শাখা। কুষাণ শাখার নেতা কুজলা কদফিসেস কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দ নাগাদ পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ইউ-চিরা ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি কাবুল, সোমায়ার, কাশ্মির অধিকার করেন। এরপর তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস সিংহাসনে বসেন। তাঁর সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক। ৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একটি অব্দ বা সম্বৎ প্রবর্তন করেন যা পরবর্তীতে শকাব্দ নামে পরিচিতি লাভ করে। ভারতে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন, এটি উত্তর-পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে পূর্বে পশ্চিমবাংলা, উত্তরে কাশ্মির থেকে দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের বাইরে বর্তমান সোভিয়েত তুর্কিস্থানের এবং আফগানিস্তানের কিছু অংশও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার তাঁর রাজধানী ছিল। বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে এখান থেকেই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শুধুমাত্র বিজেতা ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপেই নয়, বৌদ্ধধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রমুখ বহু মনীষী তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর আমলেই বৌদ্ধ ধর্ম 'মহাযান' ও 'হীনযান' –এ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাযান মতাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধকে দেবতার পর্যায়ে স্থাপন করে তাঁর মূর্তি পূজা শুরু করে। কণিষ্কের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারত ও ভারতের বাইরে প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করে তাঁর আমলে গান্ধার শিল্পরীতি নামক নতুন শিল্প রীতি গড়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি ছিল ভারতীয়, কিন্তু শিল্পরীতির দিক থেকে গ্রিক প্রভাবিত। ২৩ বছর রাজত্ব করার পর কণিষ্ক ১০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কণিষ্ক সিংহাসনে বসেছিলেন-
   (ক) ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (খ) ৭৮ খ্রিস্টাব্দে
   (গ) ১২৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ৩২০ খ্রিস্টাব্দে

২. কণিষ্ক প্রবর্তিত অব্দকে বলা হয়-
   (ক) বিক্রম সম্বৎ (খ) শকাব্দ
   (গ) গুপ্তাব্দ (ঘ) হর্ষাব্দ

৩. কণিষ্কের রাজধানী ছিল-
   (ক) পেশোয়ার (খ) তক্ষশীলা
   (গ) সারনাথ (ঘ) কণিষ্কপুর

৪. কণিষ্ক ছিলেন-
   (ক) কুষাণ (খ) শক
   (গ) গুপ্ত (ঘ) চালুক্য

৫. কণিষ্ক রাজত্ব করেছিলেন-
   (ক) ১৫ বছর (খ) ২০ বছর
   (গ) ২৩ বছর (ঘ) ৪০ বছর
   (ঙ) ৪৫ বছর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কুষাণদের আদি পরিচয় বর্ণনা করুন।
২। কুষাণদের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলোর বিবরণ দিন।
৩। কুজলা কদফিসেস ও বিম কদফিসেস সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
৪। কণিষ্কের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের তারিখ নির্ণয়সহ তাঁর রাজ্য বিজয়ের বিবরণ দিন।
২। শিল্প, সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কণিষ্কের মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People,* Vol-II, *The Age of Imperial Unity.*
২। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস।*
৩। রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস।*
৪। R.C. Majumdar, H.C. Raychowdhury, K.K. Datta, *An Advanced History of India.*

পাঠ - ৪

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কুষাণোত্তর যুগে ভারত সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- গুপ্তদের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- গুপ্তদের আদি পরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 'লিচ্ছবি' বংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

কুষাণোত্তর যুগে ভারত

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং অন্ধ্রদের শাসনাবসানের ফলে দক্ষিণ ভারতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন স্থানীয় রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটে। কুষাণ এবং অন্ধ্র শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের প্রায় সর্বত্র স্থানীয় রাজগণ বা কিছু শক্তিশালী উপদল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে এই রাজনৈতিক অনৈক্য প্রকাশিত হয়। এভাবে দেখা যায় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে শতাধিক বছর সাম্রাজ্যবাদী কোনো বৃহৎ শক্তি কর্তৃক ভারত শাসিত হয়নি। ড. ভি.এ. স্মিথ ২২০ বা ২৩০ খ্রিস্টাব্দ হতে পরবর্তী শতাধিক বছরের ভারতের ইতিহাসকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণায় কুষাণ ও গুপ্তযুগের অন্তবর্তীকাল সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় এ যুগকে বর্তমানে আর 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বলা চলে না। ইদানিং গুপ্ত যুগের সাম্রাজ্যবাদ এবং বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে কুষাণ যুগের ধারাবাহিকতা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

কুষাণ শ্রেষ্ঠ কণিষ্কের পর ভারতে স্থানীয়ভাবে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে সেগুলোর মধ্যে কোনোটি ছিল অনেকটা রাজতান্ত্রিক এবং কোনোটি প্রজাতান্ত্রিক ধরনের। রাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাজ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নাগ, অহিচ্ছত্র, অযোধ্যা, কৌশাম্বী ইত্যাদি। আর প্রজাতান্ত্রিক ধাঁচের রাজ্যগুলোর মধ্যে অর্জুনয়ন, মালব, যৌধেয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। এছাড়া লিচ্ছবি, শক ইত্যাদি গোষ্ঠী এবং পূর্ব ভারতে (বাংলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) সমতট, ডবাক, কামরূপ, কর্তৃপুর ইত্যাদি স্থানীয় রাজশক্তির কথা জানা যায়। যাহোক প্রায় দেড়শ' বছর স্থায়ী ঐক্যহীন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে ভারতে আবারো রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব ভারতের একটি রাজবংশ। গুপ্ত নামধারী এই রাজবংশের হাতেই প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় রচিত হয়। কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ ছিল বহির্ভারতীয় বা মধ্য এশীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গমাত্র। রাজ্যজয় ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি থেকেই এসেছিল কুষাণ সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য চরিত্রগতভাবে ছিল একান্তই ভারতীয়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (আনুমানিক ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত গুপ্তদের দ্বারা শাসিত হয়) খুবই গুরুত্ববহ।

গুপ্তদের ইতিহাসের উপাদান

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানার জন্য ধর্মভিত্তিক ও সাহিত্যভিত্তিক গ্রন্থাদি, বিদেশীদের বিবরণ, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উৎস রয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উপাদান হলো পুরাণ। পুরাণ হতে গুপ্ত সাম্রাজ্য, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্র তথা স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষত নারদ, বৃহস্পতি হতে অনেক তথ্য জানা যায়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী শেখর রচিত 'কমন্দক-নীতিসার' গ্রন্থ হতে গুপ্তদের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ লিপিবদ্ধ করা আছে। গুপ্ত যুগে বেশ কিছু নাটকও রচিত হয়। এ সকল নাটকের মধ্যে 'কৌমুদী-মহোৎসব' সে যুগের রাজনৈতিক অবস্থা, গুপ্ত বংশের উত্থান ও উন্নতি এবং মগধ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এছাড়া 'দেবী-চন্দ্র-গুপ্তম', 'নাট্যদর্পণ', 'মুদ্রারাক্ষস' ইত্যাদি নাটকেও গুপ্ত যুগ সম্পর্কে তথ্য আছে। 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে মৌর্যদের বিস্তারিত তথ্যের পাশাপাশি গুপ্ত আমলের কিছু বিবরণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কালিদাসের রচনাবলীতে গুপ্ত আমলের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ গুপ্তদের ইতিহাস পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিশেষ করে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, ইৎ-সিং প্রমুখের বর্ণনা গুপ্তদের আর্থ-সামাজিক, শৈল্পিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস রচনার কাজে খুবই 'বিশ্বস্ত উৎস' হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

গুপ্ত যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে শিলালিপি।এ পর্যন্ত গুপ্তদের প্রায় ৫০টি শিলালিপি ও অন্যান্য লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে।এ সকল লিপির মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' বিখ্যাত।এতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বহু তথ্য খোদাই করা আছে। এছাড়া উদয়গিরি গুহালিপি, মথুরা শিলালিপি, এরণ, নালন্দা ও গয়ালিপি, দামোদরপুরলিপি, মান্দাসরলিপি, সারনাথলিপি, গুনাইগড় লিপি, সাঁচী শিলালিপি, মেহরাওয়ালী লৌহস্তম্ভলিপি ইত্যাদি হতে গুপ্ত সম্রাটদের কৃতিত্ব, গৌরবগাঁথা ও ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটদের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এসকল মুদ্রা হতে গুপ্তদের রুচি, ব্যক্তিত্ব, ধর্মমত, সমসাময়িক মুদ্রানীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। স্বভাবতই গুপ্ত মুদ্রাগুলোতে নানা প্রকার বৈচিত্র্য ছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং মাতা কুমারদেবীর মূর্তি নিজের মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য যে, এ মুদ্রাগুলো ছিল স্মৃতিমূলক। এছাড়া সমুদ্রগুপ্ত ধনুর্ধর, বীণাবাদক, সিংহশিকারী ইত্যাদি নানাভাবে মুদ্রায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অশ্বমেধ মুদ্রা, ব্যাঘ্র শিকার, হাতির পিঠে উপবিষ্ট, নানা প্রকারের মূর্তি ইত্যাদিও প্রকাশ করা হয়েছে গুপ্ত মুদ্রায়। গুপ্তদের স্বর্ণ, রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা পাওয়া গেছে। তামার কিছু মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এই শিলালিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা এগুলোতে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ খুব একটা থাকে না। কেবল রাজপ্রশস্তি থেকে ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

গুপ্তদের আদি পরিচয় ও বাসস্থান

গুপ্ত বংশের আদি পরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমিনের দেয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে অনেকেই অনুমান করেন যে, গুপ্তরা ছিলেন পাঞ্জাবের 'জাট' বংশীয়। কিন্তু এ মতের দুর্বলতা হচ্ছে কয়েকটি তাম্রলিপিতে গুপ্তরা নিজেদেরকে 'ক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিয়েছেন। আবার গুপ্তদের সঙ্গে যে সকল রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় (যেমন লিচ্ছবি, বাকাটক বা নাগ) তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়। শূদ্র জাটদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক তাই অনেকটা অমূলক। এছাড়া গুপ্তদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে বাংলা অথবা মগধ অঞ্চলের কথা জানা যায়। এক্ষেত্রেও পাঞ্জাবের সাথে তাঁদের সম্পর্ক প্রমাণ করা বেশ দুরূহ।

ঐতিহাসিক এ্যালেনের মতে, গুপ্তরা প্রথমে প্রুপুর অর্থাৎ পাটলিপুত্র নগরের অনতিদূরে একটি অঞ্চলের (মগধ) রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিক জয়সোয়ালের মতে, গুপ্তগণের আদি বাস ছিল এলাহাবাদ অঞ্চলে। এ বিষয়ে তৃতীয় মত ব্যক্ত করেছেন ঐতিহাসিক ডি.সি. গাঙ্গুলি। তাঁর মতে, গুপ্তবংশের আদি বাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ, মগধ নয়। ইৎ-সিং-এর বিবরণের ওপর নির্ভর করে তিনি এই মতবাদ গঠন করেন। ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে ইৎ-সিং ভারত ভ্রমণে আসেন। এর পাঁচশো বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক হুই-লুন নালন্দা পরিদর্শন করেন। সে সময় মহারাজা শ্রীগুপ্ত মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো (মৃগশিখাবন) নামক স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন বলে কিংবদন্তী সূত্রে ইৎ-সিং জানতে পারেন। একই সঙ্গে এই মন্দিরের ব্যয় সংকুলানের জন্য ২৪টি গ্রামও দান করা হয়। মৃগশিখাবনের অবস্থান সম্পর্কে ইৎ-সিং বলেন, নালন্দার পূর্বদিকে গঙ্গার খাত ধরে ৪০ যোজন বা ২৪০ মাইল দূরে ছিল এই মন্দির। গঙ্গার গতিপথ ধরে চল্লিশ যোজন নালন্দার পূর্বদিকে অগ্রসর হলে মুর্শিদাবাদ বা রাঢ় দেশের অবস্থান। ড. গাঙ্গুলির মতে, শ্রীগুপ্তই হচ্ছেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলা অঞ্চলেই তাঁর বাসস্থান নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। ড. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী নেপালে একটি স্তূপের গায়ে 'বরেন্দ্রীর মৃগশিখাবন স্তূপ' লেখার ভিত্তিতে অনুমান করেন, গুপ্তদের আদি বাসস্থান বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলে বা উত্তরবঙ্গে। আবার গুপ্তদের স্বর্ণমুদ্রার বেশির ভাগ উত্তর প্রদেশে পাওয়া গেছে–এ যুক্তিতে গুপ্তদের আদি বাসস্থান উত্তর প্রদেশ বলেও অনেকেই মত দিয়েছেন।

যাহোক, উপর্যুক্ত আলোচনা হতে গুপ্তদের আদি পরিচয় ও বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পুরাণের বিবরণে গুপ্তদের আদি বাসস্থান বা রাজ্য ছিল মগধ এবং গুপ্ত রাজ্যে বাংলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ্যালেনও শেষ পর্যন্ত এই মত গ্রহণ করেছেন।এ হতে মনে হয় গুপ্তরা পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং ক্রমে তাঁরা নিজ সাম্রাজ্য বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। পক্ষান্তরে মৃগশিখাবন মন্দিরের উল্লেখ করে বাংলার গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল বলে যাঁরা মতবাদ দিয়েছেন তা থেকে মনে হয়, গুপ্তরা প্রথমে বাংলায় রাজত্ব শুরু করে পরে মগধে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। সুতরাং গুপ্তবংশের আদি পরিচয় ও বাসস্থান কোথায় ছিল তা আজো এক অমীমাংসিত বিতর্কই রয়ে গেছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসীমা

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনীতিতে যে বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বৈদেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার বিপরীতে কি করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব হলো তা ঐতিহাসিকদের সামনে এক গভীর জিজ্ঞাসা। গুপ্তদের উত্থানকে ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বৈদেশিক আক্রমণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অপর কয়েকজন ঐতিহাসিক গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় শক্তিশূন্যতা এবং গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার উর্বরা অঞ্চলের অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ছিল খুবই উর্বরা। এ অঞ্চলে ছিল প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরীগুলো, ছিল গঙ্গার জলধারা সিঞ্চিত কৃষিক্ষেত্র, গঙ্গাবাহিত বাণিজ্য। এগুলো হাতে থাকায় গুপ্তদের উত্থান সফল হয়েছে।

শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীগুপ্ত। তিনি কেবল 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করতেন। তিনি সম্ভবত মগধের অন্তর্গত কোনো ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁরই পুত্র ঘটোৎকচ; তিনিও 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করতেন। তাঁরা স্বাধীন নৃপতি নাকি সমান্তরাজ ছিলেন, তা বলা কঠিন। তবে সম্ভবত গুপ্তবংশের তৃতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিলেই পরে গুপ্তরা সার্বভৌম ক্ষমতা পায়। এই চন্দ্রগুপ্তই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সময়কাল ধরা হয় ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের কাল হতে 'গুপ্ত অব্দ' প্রচলিত হয়। রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি গুপ্তবংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রতিবেশী কোশল রাজ্যের মঘ বংশকে উৎখাত করেন। তিনি কোশল ও কোশাম্বী অধিকার করে বৃদ্ধি করেন তাঁর রাজ্যসীমা। তিনি মগধ রাজ্যও জয় করেন। শক-মুরন্ডদের

উৎখাত করে মগধ জয়ের পরই সম্ভবত তিনি বিজয়সূচক ও সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেন। ড. আর. জি. বসাকের মতে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত উত্তর বাংলা জয় করেছিলেন। অবশ্য এ তথ্য সন্দেহাতীত নয়। তবে তিনি যে উত্তর প্রদেশ ও মগধ জয় করেন তা নিশ্চিত। পাটলিপুত্র ছিল চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ সামরিক যোগ্যতা, অসাধারণ কূটনীতি, বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা এবং মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে যান। উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার এবং পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত এলাকায় তিনি গুপ্তদের আধিপত্য স্থাপন করেন।

'লিচ্ছবি' বংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, স্মিথ প্রমুখ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 'লিচ্ছবি' রাজকন্যা কুমারদেবীর সাথে বিবাহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, এই বিবাহের পেছনে গভীর কূটকৌশল বুদ্ধির পরিচয় ছিল। অবশ্য এর বিপরীত মতও রয়েছে। ড. রায়চৌধুরী মনে করেন, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'লিচ্ছবি' পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। 'লিচ্ছবি'রা ছিল প্রাচীন ও সুপরিচিত জাতিগোষ্ঠী। 'লিচ্ছবি' কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করার পর প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যোন্নতি ঘটেছিল এর প্রমাণ তাঁর মুদ্রায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতির নিচে 'লিচ্ছব্যায়ঃ' লেখা হতে বুঝতে পারা যায়। এই বিবাহের ফলে গুপ্তরা দক্ষিণ বিহারের মহামূল্য স্থানগুলোর ওপর তাদের অধিকার লাভ করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হন। উত্তর ভারতের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হতে এই বৈবাহিক সম্পর্ক দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। 'লিচ্ছবি' রাজকন্যার সাথে বিবাহকে স্মরণীয় করে রাখতে যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করা হয়েছিল তার একপাশে চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর ছবি এবং অপরপাশে সিংহের ওপর উপবিষ্ট দেবতার চিত্র অংকন করা হয়। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এ্যালেন প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, 'লিচ্ছবি' বংশে বিবাহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে কিছু রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি দিলেও কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এনে দেয়নি। তাঁদের মতে, লিচ্ছবি বিবাহের ওপর অযথাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাহোক, সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এই বিবাহজাত সন্তান। তিনি মুদ্রায় নিজেকে 'লিচ্ছবি দৌহিত্র' বলে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং 'লিচ্ছবি' বংশে বিবাহ যে গুপ্তবংশের জন্য কিছুমাত্র হলেও সৌভাগ্যসূচক ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

কুষাণোত্তর যুগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব দেখা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় শক্তিশূন্যতা এবং গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার উর্বরাভূমির ওপর ভিত্তি করেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। গুপ্তদের সম্পর্কে নানা ধরনের উপাদান থেকে তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, শ্রীগুপ্তই গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভবের অগ্রদূত। তবে তাঁর পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে গুপ্তদের বিকাশ লক্ষ করা যায়। পাটলিপুত্রকে রাজধানী করে মগধ, উত্তর প্রদেশ ও নিকটবর্তী অঞ্চলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'লিচ্ছবি' রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। এই বৈবাহিক সম্পর্ক গুপ্তদের মর্যাদাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। তাই এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনকাল চিহ্নিত করুন–
   (ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ থেকে ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড়
   (খ) ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড়
   (গ) খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ থেকে ৩২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড়
   (ঘ) ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড়।

২। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' কে রচনা করেন?
   (ক) রাজশেখর (খ) বরাহমিহির
   (গ) গুরবমিশ্র (ঘ) হরিষেণ

৩। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
   (ক) ঘটোৎকচগুপ্ত (খ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
   (গ) শ্রীগুপ্ত (ঘ) নরেন্দ্রগুপ্ত

৪। লিচ্ছবি দৌহিত্র কে ছিলেন?
   (ক) শ্রীগুপ্ত (খ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
   (গ) সমুদ্রগুপ্ত (ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কুষাণোত্তর যুগের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ লিখুন।
২। গুপ্তদের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎস হিসেবে শিলালিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। গুপ্তদের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসসমূহ পর্যালোচনা করুন।
২। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
৩। গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস বিবৃত করুন।
৪। 'লিচ্ছবি' বিবাহের বিশেষ উল্লেখপূর্বক প্রথম চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar (ed.), *The History and Culture of the Indian People,* Vol III *(The Classical Age)*.
২। R.D. Banerjee, *Age of the Imperial Guptas*.
৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, (১ম খন্ড)।
৪। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, (১ম খন্ড)।

পাঠ - ৫

সমুদ্রগুপ্ত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি–

- সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার নীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের উপাদান

পূর্বের পাঠ হতে আপনারা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের মনোনয়ন সম্পর্কে জেনেছেন। সমুদ্রগুপ্ত সম্ভাব্য ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই সম্রাটের ইতিহাস পুনর্গঠনের বেশ কিছু উপাদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রাজকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', এরন, নালন্দা ও গয়ালিপি, পাঁচ ধরনের মুদ্রা, চৈনিক বিবরণ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, 'কৌমুদী মহোৎসব' নামক একটি নাটিকা, কালিদাসের 'রঘুবংশম্' ইত্যাদি বিখ্যাত। এ সকল উপাদানের মধ্যে 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ঐতিহাসিক মহলে সমাদৃত। এলাহাবাদের দুর্গে রক্ষিত এই প্রশস্তিখানি সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরই উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পর এটি রচিত হয়। প্রশস্তিটি আংশিক পদ্যে, আংশিক গদ্যে রচিত। হরিষেণ যেহেতু সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি সেহেতু তাঁর বর্ণিত দিগ্বিজয় কাহিনীতে কিছু অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। অলংকৃত সংস্কৃতে রচিত এই লিপিটির ছত্রে ছত্রে সমুদ্রগুপ্তের 'সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ' ছড়িয়ে আছে বলে ড. কোশাম্বী মত ব্যক্ত করেন।তবে এই রাজপ্রশস্তিটি সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষা, বিদ্যোৎসাহিতা, রাজ্য জয় ও রাজ্যশাসন এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রদান করে।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজ্য বিজেতারূপে যে সকল সম্রাট খ্যাতি লাভ করেছেন, সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার স্থানীয় একটি রাজ্যকে তিনি সর্বভারতীয় এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রাচীন ভারতের তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত বিখ্যাত। বস্তুত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের পর এতো বড় বিজয়ী বীর ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয় সম্পর্কে হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের নয় জন রাজাকে পরাজিত করেন। এঁরা হলেন অচ্যুত, নাগসেন, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, গণপতিনাগ, নন্দী ও বলবর্মণ। এঁদের মধ্যে গণপতিনাগ (মথুরার নাগবংশের রাজা), নাগসেন (পদ্মাবতী বা গোয়ালিয়র অঞ্চলের রাজা), অচ্যুত (অহিচ্ছত্র বা উত্তর প্রদেশের রামনগর ও রায়বেরিলি'র রাজা) এবং চন্দ্রবর্মণের (পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া অঞ্চলের রাজা) পরিচয় জানা যায়। বাকি পাঁচ জনের সঠিক সনাক্তকরণ এখনও সম্ভব হয়নি। যাহোক, উত্তর ভারত বা আর্যাবর্ত জয়ের ক্ষেত্রে সমুদ্রগুপ্ত

কৌটিল্য ও ম্যাকিয়াভেলীর নীতি পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'যিনি অধিকতর ক্ষমতাশালী তিনি যুদ্ধ করবেন। যার প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ থাকবে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।' আর্যাবর্তের রাজাগণের প্রতি তাঁর যুদ্ধনীতি ছিল সম্পূর্ণ উচ্ছেদের। উল্লিখিত ৯ জন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত তাদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

সমুদ্রগুপ্ত কেবল আর্যাবর্তের রাজগণের উচ্ছেদ সাধন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি মধ্যভারতের আটবিক রাজ্য অর্থাৎ অরণ্য রাজ্যগুলোও পদানত করেছিলেন। এ সকল অরণ্য রাজ্য বা আটবিক রাজ্য গাজীপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এরণ লিপিতে এ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।

আটবিক রাজ্যজয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত জয় করেন। এ সংক্রান্ত তথ্য এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যে রাজ্য জয় করলেও রাজ্যগুলোকে অধিগ্রহণ করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধার বিচারে সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যে অনেকটা 'ধর্ম বিজয়ী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি পরাজিত রাজাদের আনুগত্য আদায় করে রাজ্যগুলো ফিরিয়ে দেন অথবা করদ রাজ্যে পরিণত করেন। সভাকবি হরিষেণ বলেন, সমুদ্রগুপ্ত 'গ্রহণ-পরিমোক্ষ নীতি' নেন। এ নীতির অর্থ হলো– প্রথমে গ্রহণ অর্থাৎ শত্রুকে শক্তির জোরে বন্দি করা এবং তাঁর বশ্যতা আদায়ের পর মোক্ষ দান বা মুক্তি দেয়া। পরাজিত রাজা রাজ্য ফিরে পেতেন কিন্তু সার্বভৌমত্ব পেতেন না। যাহোক, সমুদ্রগুপ্তের অভিযান সাধারণত: মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ও পূর্বভাগ, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলের কাঞ্চী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভূ-ভাগের বারো জন রাজা ও রাজ্যের নাম এলাহাবাদ প্রশস্তি সূত্রে জানা যায় যাদের ওপর 'গ্রহণ পরিমোক্ষ নীতি' প্রয়োগ করা হয়েছিল। এঁরা হলেন কোশলের (দক্ষিণ কোশল বা বিলাস ও মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলা এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলা) মহেন্দ্র, মহাকান্তারের (মধ্য ভারতের বনাঞ্চল) ব্যাঘ্ররাজ, কৌরলের (মধ্যপ্রদেশের শোন্‌পুর জেলা) মন্তরাজ, কোত্তুরের (গঞ্জাম জেলার কোট্টুর) স্বামীদত্ত, পিষ্ঠপুরমের (অন্ধ্রের গোদাবরী জেলা) মহেন্দ্রগিরি, ইরন্দপল্লের (ভিজাগাপট্টম জেলা) দামন, কাঞ্চির (তামিলনাড়ুর কাঞ্চিভরম জেলা) বিষ্ণুগোপ, বেঙ্গীর (কৃষ্ণা গোদাবরী জেলার ইলোর) হস্তিবর্মণ, অবমুক্তার (কাঞ্চির নিকটবর্তী স্থান) বা আরামকুটের নীলরাজ, পল্লাকের (নেল্লোর জেলা) উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের (সম্ভবত: ভিজাগাপট্টম) কুবের এবং কুস্থলপুরের (উত্তর আর্কট জেলা) ধনঞ্জয়।

সমুদ্রগুপ্তের দ্বিমুখী নীতির (সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা সামন্তরাজ্য হিসাবে চলতে দেয়া) ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তের বেশ কয়েকজন রাজা বা গোষ্ঠীপতি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা), ডবাক (আসামের নওগাঁ জেলা বা বাংলারর ঢাকা জেলা), কামরূপ (উত্তর আসাম), নেপাল ও কর্তৃপুরের (সনাক্তকরণ বিতর্কিত) নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিম ভারতের শক রাজগণ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের কুষাণ রাজগণও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এছাড়া পূর্ব রাজপুতানা ও মান্দাসর এলাকার 'মালব', রাজস্থানের জয়পুর ও আলোয়ারের 'অর্জুনায়ন', পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত শতদ্রু নদীর উভয় তীরের বাসিন্দা 'যৌধেয়', মধ্যপ্রদেশের সাঁচী এলাকার 'আবীর', 'খরপরীক', ভিলসার 'কাক' জাতি সমুদ্রগুপ্তের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রশস্তি অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্ত কনৌজ বা পুষ্পপুর হতে সমস্ত অভিযান পরিচালনা করেন। আর্যাবর্তের সকল রাজাকে পরাজিত করে তিনি 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করেন। হরিষেণের মতে, পরাজিত রাজন্যবর্গ 'কর প্রদান করে, আদেশ পালন করে ও বশ্যতা জ্ঞাপন করে সমুদ্রগুপ্তের সম্রাটোচিত নির্দেশ পালন করেছিল।' সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ছিল প্রভুত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের এক অপূর্ব সমন্বয়। দিগ্বিজয় সম্পন্ন করে তিনি 'অশ্বমেধযজ্ঞ' অনুষ্ঠান করেন এবং এই যজ্ঞের স্মৃতিরক্ষায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন।

সাম্রাজ্যসীমা

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার নীতি ও যুদ্ধ বিগ্রহের আলোচনা থেকে তাঁর সাম্রাজ্যসীমা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলা ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপন করেন। তার বাইরে সামন্তরাজ্যের পরিমন্ডল তিনি স্থাপন করেন। পূর্ব ভারতে সমতট, ডবাক, নেপাল ; পশ্চিমে মালব, উত্তর-পশ্চিমে খরপরিকগণ এই পরিমন্ডল রচনা করে। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রত্যক্ষ ও করদ রাজ্য মিলিয়ে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসীমা ধরেছেন– কাশ্মির, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাট ব্যতিত সমগ্র উত্তর ভারত; দক্ষিণে উড়িষ্যার ছত্তিসগড় হয়ে পূর্ব উপকূল ধরে তামিলনাড়ুর চিঙ্গেলকোট জেলা পর্যন্ত। এছাড়া সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমার বাইরে প্রতিবেশীরাও তাঁর পরাক্রম অনুভব করে দ্রুত তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের বাইরেও তাঁর 'প্রভাব বলয়' বিস্তৃত ছিল।

রাজ্য জয়ের প্রকৃতি

সমুদ্রগুপ্ত এই নীতি নিয়ে কখনোই ইতস্ড়ত করেননি, রাজ্য অধিগ্রহণ করাই হলো রাজার প্রধান কর্তব্য কাজ। তিনি ছিলেন প্রচন্ড সাম্রাজ্যবাদী। ড. স্মিথ সম্ভবত এ কারণেই সমুদ্রগুপ্তকে "ভারতীয় নেপোলিয়ন" আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতভূমিকে এক শাসনে আবদ্ধ করাই ছিল সমুদ্রগুপ্তের লক্ষ। অনেকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাম্রাজ্যবাদ লক্ষ করেছেন। অধ্যাপক রোমিলা থাপারের মতে, সমুদ্রগুপ্ত সারা ভারতে ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে দেন। অনেকে আবার সমুদ্রগুপ্তকে 'ধর্মবিজয়ী' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। 'গ্রহণ-পরিমোক্ষ' নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বলেন, সমুদ্রগুপ্তকে সাম্রাজ্যবাদী বা আগ্রাসী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন অর্থাৎ অখন্ড ভারত সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল সমুদ্রগুপ্তের প্রধান চালিকাশক্তি। অবশ্য অনেকে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষ করেছেন। দক্ষিণের অপরিমিত সম্পদ সংগ্রহ, গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার কৃষি সম্পদ হস্তগত করা ইত্যাদি কারণেই সমুদ্রগুপ্ত যুদ্ধ বিগ্রহ করেছেন। যাহোক, একথা বলা প্রয়োজন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্য একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উদ্ভুত হয়েছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনীতিতে যে শক্তিশূন্যতা দেখা দেয় গুপ্ত সাম্রাজ্য তা দূর করে।

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

এলাহাবাদের শিলালিপি অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্ত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি গান গাইতে ও বীণা বাজাতে পারতেন। কতিপয় স্বর্ণমুদ্রায় তাঁকে বীণাবাদক রূপে পালঙ্কে উপবিষ্ট দেখা যায়। কবিতা রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। 'কবিরাজ' উপাধি দেখে মনে হয় সম্ভবত তিনি প্রথম শ্রেণীর অজস্র কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু কালের কবলে পড়ে তা বিলীন হয়ে গেছে। অশোকের ন্যায় সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমের সাহায্যে দিগ্বিজয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু উভয়ের পরাক্রম ও দিগ্বিজয়ের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। একজনের অস্ত্র হলো ন্যায়, ধর্ম ও পরোপকারিতা এবং অপরজনের অস্ত্র, সামরিক শক্তি ও বুদ্ধি। অশোক আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান; আর সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে বলীয়ান। অশোকের ব্যক্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আবার সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার না করার উপায় নেই। সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাই ছিলেন না, ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসকও। দক্ষিণ ভারতে তাঁর মিত্রতামূলক নীতি তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। সমুদ্রগুপ্ত তাঁর সামরিক প্রতিভা এবং কূটনৈতিক শক্তিতে ভারতব্যাপী রাজনীতিক একতার সূত্রপাত ঘটান। অশোকের ধর্ম-বিজয় অপেক্ষা তা কম গৌরবের নয়। অশোকের ধর্মনীতি, কর্মনীতি ও বাস্তব বুদ্ধির ন্যায় সমুদ্রগুপ্তের উদারতা, বিদ্যোৎসাহিতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও

রাজনীতিক দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়। কথিত আছে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত বসুবন্ধু তাঁর মন্ত্রী এবং হরিষেণ তাঁর সভাকবি ছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়েও বৌদ্ধ, জৈন বা অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন না। হরিষেণের প্রশস্তিতে, সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে অত্যুক্তি থাকলেও তাঁর কৃতিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন সাধুব্যক্তিদের আশাস্বরূপ, আর অসাধুদের জন্য প্রলয়। হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তকে মানুষের আকৃতিতে দেবতা তুল্য 'অচিন্ত্যপুরুষ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সমুদ্রগুপ্ত হচ্ছেন প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সভাকবি হরিষেণের প্রশস্তি থেকে এই দিগ্বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তবে এ বিবরণে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। তা সত্তেও অন্যান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় আর্যাবর্তের বিশাল এক অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসন এবং এর সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরোক্ষ শাসনাধীন ছিল। তিনি বিজয়সূচক 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর সামরিক কৃতিত্বের সূত্র ধরেই তাঁকে 'ভারতীয় নোপোলিয়ন' বলা হয়েছে। লিচ্ছবি দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্তকে 'অচিন্ত্যপুরুষ'ও বলা হয়। কেবল দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাই নয় তিনি একাধারে সুদক্ষ শাসক এবং কবিতা ও সঙ্গীত রসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবেও পরিচিত। বহুমুখী প্রতিভাবান এই সম্রাটই কার্যকরভাবে ভারতকে এক সুতোর মালায় গাঁথবার চেষ্টা করে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। কোন্‌টি সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের প্রধান উৎস?
- (ক) এরণ লিপি
- (খ) গয়ালিপি
- (গ) এলাহাবাদ প্রশস্তিলিপি
- (ঘ) সুসুনিয়া লিপি।

২। চন্দ্রবর্মণ কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?
- (ক) পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া অঞ্চলের
- (খ) মথুরার নাগবংশের রাজা
- (গ) মধ্যপ্রদেশের শোন্‌পুর অঞ্চলের
- (ঘ) গোয়ালিয়র অঞ্চলের রাজা

৩। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে কোন নীতি অবলম্বন করেন?
- (ক) কৌটিল্যীয় নীতি
- (খ) ম্যাকিয়াভ্যালীর নীতি
- (গ) রক্ত ও লৌহ নীতি
- (ঘ) গ্রহণ-পরিমোক্ষ নীতি

৪। নিম্নোক্ত কোন রাজ্যটি দক্ষিণ ভারতের নয়?
- (ক) কোশল
- (খ) মহাকান্তার
- (গ) কাঞ্চি
- (ঘ) কনৌজ

৫। কোন ঐতিহাসিক সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন?
- (ক) ড. স্মিথ
- (খ) ড. আর.সি. মজুমদার
- (গ) ব্যাশাম
- (ঘ) অধ্যাপক রোমিলা থাপার

৬। উত্তর ভারতে সামরিক সাফল্যের পর সমুদ্রগুপ্ত কোন উপাধি ধারণ করেন?
- (ক) অচিন্ত্যপুরুষ
- (খ) কবিরাজ
- (গ) সর্বরাজোচ্ছেত্তা
- (ঘ) মহারাজাধিরাজ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজয় বর্ণনা করুন।
২। অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কি একই প্রকৃতির ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। এলাহাবাদ প্রশস্তির আলোকে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
২। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পর্যালোচনা করুন।তিনি কতোদূর সাফল্য লাভ করেছিলেন?
৩। সমুদ্রগুপ্তকে গুপ্তরাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলার পেছনে যুক্তিগুলো কি– আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People,* Vol- III, *Classical Age*.
২। R.D. Banerji, *Age of Imperial Guptas.*
৩। P.L. Gupta, *Gupta Empire.*
৪। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস।*
৫। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, (১ম খন্ড)।
৬। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, (১ম খন্ড)

পাঠ - ৬

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতির পরিচয় পাবেন ;
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- 'শকারি বিক্রমাদিত্য' সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সিংহাসনারোহণ

সমুদ্রগুপ্ত জীবিতাবস্থায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এই মনোনয়ন অনুসারে তিনি ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে পৈত্রিক রাজ্য লাভ করে অতীব যোগ্যতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতামহের নামও চন্দ্রগুপ্ত ছিল বলে নতুন ভূ-পতি ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলে। তিনি জীবনের শেষভাগে 'বিক্রমাদিত্য' (সূর্যসম পরাক্রান্ত) উপাধি ধারণ করেন। অবশ্য তিনি আরো বেশ কিছু নামে অভিহিত ছিলেন, যথা- নরেন্দ্রচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, দেবরাজ, দেবশ্রী, দেবগুপ্ত ইত্যাদি।

কতিপয় আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হলে তাঁর প্রথম সন্তান রামগুপ্ত রাজা হন। তিনি এতো দুর্বলচেতা ছিলেন যে, ব্যক্তিগত মান-সম্মানও রক্ষা করতে পারতেন না। একদা তিনি প্রাণের ভয়ে তাঁর সহধর্মিণী ধ্রুবদেবীকে এক অত্যাচারী শক শাসকের হাতে তুলে দিতে সম্মত হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই নরপিশাচকে হত্যা করে রাণীর মর্যাদা রক্ষা করেন। অত:পর তিনি অগ্রজ রামগুপ্তের প্রাণ সংহার করে সিংহাসন লাভের একমাত্র কন্টক দূর করার মাধ্যমে ধ্রুবদেবীকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করেন। অবশ্য আজ পর্যন্ত এ কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি। এমনকি সমসাময়িক উৎকীর্ণ কোনো লিপিতেও রামগুপ্ত নামে কোনো যুবরাজের উল্লেখ দেখা যায় না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রায় দুইশত বছর পরে সপ্তম শতাব্দীর 'হর্ষচরিত' রচয়িতা বাণভট্টের 'দেবী চন্দ্রগুপ্তম্' নাটকে প্রথম চোখে পড়ে যে, চন্দ্রগুপ্ত প্রণয়িনীর ছদ্মবেশে অন্ত:পুরে প্রবেশ করে কামার্ত শকরাজ যখন পরকীয়া প্রেমে মত্ত ছিলেন তখন তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেন। এই শক রাজার নাম রুদ্রসিংহ হলেও আখ্যায়িকায় রামগুপ্ত বা ধ্রুবদেবীর উল্লেখ নেই। এ অবস্থায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

রাজ্যবিস্তার

উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। পিতার ন্যায় তিনিও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। প্রথম হতেই তিনি 'বিশ্বজয়' (এখানে সংকীর্ণ অর্থে ভারত জয়) করার প্রবল বাসনা অন্তরে পোষণ

করতেন।এই উদ্দেশ্যে প্রায়ই তিনি পরবর্তীকালীন ইউরোপের হ্যাপসবার্গ ও বুরবন এবং ভারতবর্ষের 'মহান' মোগলদের ন্যায় বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা শক্তিশালী রাজাদেরকে মিত্রতামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন, অন্যথায় সামরিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হতো।প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজদুহিতা কুমারদেবীকে বিবাহ করে যে রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন,সমুদ্রগুপ্ত বৈদেশিক রাজকুমারীদেরকে উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করে যে রাজ্যের স্থায়িত্ব এনে দেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও একই পন্থায় সেই রাজ্যের শক্তি ও স্থিতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি নাগ ও বাকাটক রাজবংশের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। তিনি নিজে নাগ রাজকন্যা কুবেরদেবীকে বিবাহ করেন ও তার ফলে ভারতের পূর্ব সীমান্তে গুপ্ত সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। এরপর তিনি নিজ কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বাকাটক নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনার বিবাহ দিয়ে ঐ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ হন। নাগ ও বাকাটকদের সাথে এই বন্ধুত্বপুর্ণ সম্বন্ধ পশ্চিম ভারতের শকগণের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, কারণ তাঁরা যে ভূ-খন্ডে রাজত্ব করতেন তা হতে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্য আক্রমণকারী উত্তর ভারতীয় শাসককে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য অথবা বাধা প্রদান করতে পারতেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরবর্তী সময়ে শক রাজ্যগুলো অধিকার করেন। শকদের ধ্বংস করে তিনি 'শকারি' উপাধি নেন। শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাকাটকদের সক্রিয় সাহায্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাফল্য নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। পশ্চিম মালব, গুজরাট ও কাথিওয়ার বা সৌরাষ্ট্রে শক শাসনের অবসানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়– এভাবে গুপ্ত আমলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পথও হয় প্রশস্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাটলিপুত্র এবং পরে উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্য তথা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

'শকারি বিক্রমাদিত্য' ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি কিনা, বলা দুরূহ। জনশ্রুতি অনুসারে, প্রাচীন ভারতে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মালব, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র বা কাথিওয়ারের শকদেরকে পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন। 'বিক্রম সম্বৎ নামে একটি নতুন সাল গণনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উৎসাহ দান এবং নয়জন পন্ডিতকে নিয়ে 'নবরত্ন' সভা গঠন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অদ্যাপি উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা বা স্তম্ভ লিপিতে এরূপ কোনো রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়নি। কিন্তু উল্লিখিত প্রায় সব কাজই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পন্ন করেছিলেন বলে জানা যায় (বিক্রম সম্বতের প্রচলন ব্যতিত)। মহাকবি কালিদাস তাঁর সমসাময়িক ছিলেন ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। নিজ বাহুবলের ওপর নির্ভর করে তিনি শকদের রাজধানীতে প্রবেশ করতে অসাধারণ সাহস ও নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন। বহুদিন পর তাঁর শক বিজয়ের কাহিনী কিংবদন্তী আকারে চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সুতরাং কিংবদন্তীর নায়ক ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। এ মতের বিরোধীতা করে অনেকে বলেন, 'নবরত্ন' সভার অনেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় জীবিত ছিলেন না। যেমন, জ্যোতির্বিদ বরাহ্‌মিহির যে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন না একথা নিশ্চিত। এছাড়া কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমাদিত্য 'বিক্রম সম্বৎ' প্রবর্তন করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫২ অব্দে। সুতরাং কোনোক্রমেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে এর প্রবর্তক বলা চলে না। তবে সম্ভবত এই অব্দের সাথে 'বিক্রম' নামের যোগাযোগ পরবর্তী যুগের আবিষ্কার। যাই হোক না কেন, বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তী জনমানসে পরবর্তী যুগে একাধারে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সংস্কৃতি প্রয়াস ও স্কন্দগুপ্তের হূণ বিজয়কে মিশ্রিত করে গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

পাশ্চাত্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনে উজ্জয়িনীর স্থান

অতি প্রাচীনকাল হতেই ব্রোচ, সোপার, কাম্বে প্রভৃতি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলো সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। পাশ্চাত্য দেশ হতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিদেশী বণিকগণ এ সকল বন্দরে আসতেন। চন্দ্রগুপ্ত মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করায় এ বন্দরগুলো তাঁর হাতে পড়ে– ফলে বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ রাজকোষে জমা হয়। এদিকে বণিকদের সামুদ্রিক বন্দরে যেতে উজ্জয়িনীর পথই প্রশস্ত; উজ্জয়িনীতে পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে বিভিন্ন বন্দরে প্রেরণ করা সহজ এবং নিরাপত্তা ও আর্থিক দিক দিয়ে ছিল অধিকতর সুবিধাজনক। বস্তুত আবহমান কাল ধরে উজ্জয়িনী ছিল স্থল বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র। হিন্দুদের কাছে বারাণসীর পরই এটি ছিল দ্বিতীয় পবিত্র স্থান। সর্বোপরি এই অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত উর্বরা। প্রতি বছর এখানে প্রচুর ফসল জন্মাতো। ফসল হতে আবার ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটে ও যথেষ্ট অর্থাগম হয়। এর সুবিধা নিয়ে বহির্বাণিজ্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথও সুগম হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই অঞ্চলের সামগ্রিক সুবিধা অত্যন্ত বুদ্ধির সাথে ব্যবহার করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব

গুপ্তবংশের প্রধান রাজাদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ব্যতিত সকলেই দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বেলাতেও এই সত্যের ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। এ সময়ের মধ্যে অশান্তি বা বিদ্রোহের কথা তেমন শোনা যায়নি। এটা রাজার শক্তিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কঠোরতার পরিচায়ক। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কেউ কোনোদিন শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ করতে বা রাজাদেশ লংঘন করতে সাহস পেতেন না। রাজা যেমন জমকালো উপাধি ভালোবাসতেন তেমনি বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করতেন। তাঁর আমলে প্রকাশিত দুই ধরনের স্বর্ণমুদ্রা দেখা যায়। কতোগুলো স্বর্ণমুদ্রায় তিনি তীর-ধনুক হাতে বীর বেশে দন্ডায়মান। আবার অপর কয়েকটিতে তিনি সিংহের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ। বিদ্যা ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর এক অনন্য সাধারণ গুণ। কথিত আছে, তাঁর রাজসভা 'নবরত্ন' নামে নয়জন পন্ডিত দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। মহাকবি কালিদাস তাঁর সভার অন্যতম অলঙ্কার ছিলেন।

যাহোক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য উন্নতি ও গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। সমুদ্রগুপ্তকে যদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তারকর্তা বলা যায় তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সেই সাম্রাজ্যের সংগঠক বলা চলে। তিনি ছিলেন একাধারে একজন বীরযোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী হিসাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। পশ্চিম ভারত থেকে শকদের বিতাড়ন তার মুখ্য সামরিক কৃতিত্ব। এ কারণে তিনি 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন। এছাড়াও অন্যান্য দিকে তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি নাগ ও বাকাটক বংশীয় রাজাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মহাকবি কালিদাসসহ অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। শৌর্য-বীর্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় বহন করে তাঁর রাজত্বকাল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সম্ভবত কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন ভারত সফর করেন। ফা-হিয়েনের বিবরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনচিত্রের অনেকটাই বিধৃত হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাদের সাথে বিশেষ পন্থায় মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন?
(ক) লিচ্ছবি ও নাগ বংশের সাথে (খ) লিচ্ছবি ও শকদের সাথে
(গ) নাগ ও হূণদের সাথে (ঘ) বাকাটক ও নাগদের সাথে।

২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রথম রাজধানী কোনটি?
(ক) উজ্জয়িনী (খ) কাথিয়াওয়ার
(গ) পাটলিপুত্র (ঘ) গুজরাট

৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে স্থল বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র ছিল কোনটি?
(ক) উজ্জয়িনী (খ) সোপার
(গ) বারাণসী (ঘ) পাটলিপুত্র।

৪। কোন চৈনিক পর্যটক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারত ভ্রমণ করেন?
(ক) হিউয়েন সাং (খ) ফা-হিয়েন
(গ) ইৎ-সিং (ঘ) শৈং ছি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় উল্লেখপূর্বক তাঁর সাম্রাজ্যসীমা বর্ণনা করুন।

২। উজ্জয়িনী সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। আপনি কি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংগঠক বলে মনে করেন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বিবরণ দিন। তিনি কিভাবে শক শাসনের অবসান ঘটান ?

২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। আপনি কি মনে করেন যে, তাঁকে কেন্দ্র করেই 'বিক্রমাদিত্য কিংবদন্তী'র সৃষ্টি হয়েছিল ?

৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ও উন্নতির পরিচয় দিন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People,* Vol- III, *Classical Age*.

২। R.D. Banerjee, *Age of Imperial Guptas.*

৩। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, (১ম খন্ড)।

৪। অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস।*

পাঠ - ৭

গুপ্ত যুগের গৌরব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- গুপ্ত যুগে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চরমোন্নতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- শিল্পকলার বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার অগ্রগতি ও গুরুত্ব বিষয়ে ধারণা পাবেন ;
- প্রাচীন ভারতের 'ধ্রুপদী' সংস্কৃতির পরিচয় পাবেন।

রাজনৈতিক একতা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তসাম্রাজ্যই শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের পুষ্যভূতি, গুর্জর-প্রতীহার, পাল, রাষ্ট্রকূট ও চোল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু আয়তন, স্থায়িত্ব ও মান-মর্যাদার দিক দিয়ে এদের কোনটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমকক্ষ নয়। গুপ্তদের শাসনামল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। অশোকের সাম্রাজ্যের মতো বিশাল না হলেও সভ্যতার ক্ষেত্রে গুপ্তগণ উল্লেখিত শক্তির তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। উত্তর-পশ্চিম ভারত বা সুদূর দাক্ষিণাত্যে প্রত্যক্ষভাবে শাসন সম্প্রসারণে তারা সফল হননি; বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহবিবাদে তাঁদের রাজ্যটি শেষ পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়– এ হেন দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক সত্ত্বেও গুপ্তগণ দুইশত বৎসর যাবত আর্যাবর্তে একতার উৎসরূপে কাজ করেন।

গুপ্তদের গৌরব রাজ্যের বিশালতা ওপর নির্ভর করে না; বরং উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ঐক্যের চেতনাই এর অন্যতম আকর্ষণ। দয়া-মায়া, সদ্বিবেচনা ও সহৃদয়তার সাথে দৃঢ়তা মিশ্রিত এমন সুশাসনের দৃষ্টান্ত আগে আর কোনদিন দেখা যায়নি।

সাহিত্য

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁদের দান অবিস্মরণীয়। অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি এবং সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষের জন্য গুপ্ত যুগ সুবিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্ত নিজে উচ্চশ্রেণীর কবি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য হলে তাঁরা ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈদেশিক রাষ্ট্র ও লেখকগণের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় গুপ্ত রাজ্যে সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। সম্রাট অশোকের সময় থেকে সংস্কৃত চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়; তবে গুপ্তদের শাসনকালে এটি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ বীরসেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তির ভাষা অত্যন্ত উন্নতমানের এবং উপভোগ্য। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রায়ও সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যবহার লক্ষণীয়। মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় থেকে 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'রঘুবংশ' মহাকাব্য সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর; 'কুমার সম্ভব' হিন্দুদেবতা শিবের প্রতি গুপ্তদের ভক্তি-পুস্পাঞ্জলি, 'মেঘদূত' চমৎকার গীতি-কবিতা, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর অন্যতম এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পুষ্যমিত্রের পুত্র

অগ্নিমিত্রের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই যুগে অপর যে সকল কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের দানে প্রাচীন সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা বিশাখদত্ত, 'মৃচ্ছকটিক' প্রণেতা শূদ্রক, 'শব্দকোষ' বা অভিধান লেখক অমরসিংহ, বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু ও দিগনাগ, জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত প্রধান। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে যে উচ্চমার্গীয় নাট্য-সাহিত্য লেখা হতো 'মৃচ্ছকটিক' তাঁর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' এবং 'দেবী চন্দ্রগুপ্তম' নাটকের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

গুপ্ত যুগ ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও গুরুত্বপুর্ণ।এই যুগেই মহাভারত ও পুরাণগুলো সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়। এগুলো নব-সম্পাদনা ও রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বিপরীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা।যাহোক, কিংবদন্তী, গল্প, ধর্মোপদেশ, নীতিমালা ও আধ্যাত্মিক দর্শন ছিল পৌরাণিক সাহিত্যের প্রধান সম্পদ। ব্রাহ্মণগণ সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোকে নতুন করে সহজ সংস্কৃতে পরিবেশন করেন।আজকাল আমরা বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও স্কন্ধপুরাণ প্রভৃতি যেসকল সাম্প্রদায়িক পুরাণ দেখতে পাই সেগুলোও তখন জন্মগ্রহণ করে; বিবর্তনবাদের ধারা অনুসরণ করে স্মৃতি বদলে যায় এবং মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য বর্তমান আকারে প্রকাশিত হয়।

গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা

গুপ্তযুগের অপর একটি গৌরবের দিক হচ্ছে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি। এ সকল বিষয়ের প্রধান দিকপাল ছিলেন আর্যভট্ট। অনেকেই তাঁকে 'ভারতীয় নিউটন' বলে আখ্যা দেন। তিনি প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মন্তব্য করেন যে, পৃথিবী আপন মেরুদন্ডের ওপর থেকে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। তিনি আহ্নিক গতি ও বার্ষিকগতিও আবিষ্কার করেন। সংখ্যা গণিতে '০'(শূন্য) সংখ্যার প্রচলনের মাধ্যমে অঙ্কশাস্ত্রে বৈপ্লবিক যুগের সূচনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই যুগে দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। পরবর্তীকালে আরবজাতি এই উপমহাদেশ হতে শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার শিখে তা ইউরোপে প্রচার করেন। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে শূন্যের প্রচলন তার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই একথা বলা অমূলক নয় যে, গণিত শাস্ত্রে জগৎ প্রাচীন ভারতের কাছে একান্তভাবেই ঋণী। বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে) গ্রিক বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি গ্রিসের শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যা হতে কতগুলো শব্দ চয়ন করে ভারতীয় ভাষায় ব্যবহারের মাধ্যমে একে যথেষ্ট শক্তিশালী ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী করেন। তাঁর রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে দিক নির্দেশক। বাগভট্ট নামে একজন পন্ডিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় সেকালে ভারত এতোটাই এগিয়েছিল যে, শব-ব্যবচ্ছেদ তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় পাঠ ছিল বলে জানা যায়।

শিক্ষা-দীক্ষা

গুপ্ত যুগে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। নালন্দা, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সারনাথ এবং অজন্তা তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।এ সকল স্থানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। বিহারের নালন্দা বিহারে মহাযান বৌদ্ধমতের ওপর বিশেষভাবে পড়ানো হতো। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত তক্ষশীলা ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত পাণিনি, কৌটিল্য, চরক প্রমুখ। এছাড়া গুজরাটে বল্লভী এবং অন্যান্য অসংখ্য স্থানে নানা ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এসব স্থানে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, ধর্ম এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান আহরণ করতো। গুপ্ত শাসকগণ এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক।

সঙ্গীত ও শিল্পকলা

সমুদ্রগুপ্ত কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসংগীতের প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গান-বাজনার আসর বসে এবং গায়ক ও বাদ্যকরেরা সঙ্গীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করে। এছাড়া শিল্পকলার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। এই যুগকে ভারতীয় শিল্পকলার 'উৎকর্ষের যুগ' বলা যেতে পারে। মথুরা, বারাণসী ও পাটলিপুত্র ছিল শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা– এই তিনটি পরস্পর ঘনিষ্ট মাধ্যমে গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার প্রসার ঘটে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি জেলার দেওঘরে গুপ্তদের নির্মিত প্রস্তর মন্দির আজও বর্তমান।এর দেয়ালের খোপে ভারতীয় ভাস্কর্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নমুনা আছে।কানপুর জেলায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটি ইট নির্মিত মন্দির রয়েছে। এছাড়া বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথের বিধ্বস্ত ভাস্কর্যের চিহ্নাদি গুপ্তযুগের সুদৃশ্য সারনাথ প্রস্তর মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম মন্দিরের চূড়া উঁচু করে তৈরি করা শুরু হয়। এছাড়া এ যুগের মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় রীতি ও নাগর রীতির লক্ষণীয় প্রভাব বিদ্যমান। সেকালের শিল্পী ও কারিগরেরা শিল্পের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধাতব শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে দিল্লিতে একটি লৌহস্তম্ভ স্থাপিত হয়। এটি ২৩ ফুটের অধিক উঁচু, অতিশয় মসৃণ এবং বর্তমান বিশ্বেরও বিস্ময়। হাজার বছরের রোদ, বৃষ্টি, ঝড় এতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। স্তম্ভটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোনালী বর্ণে রঞ্জিত হয়ে ওঠে এবং বেলা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলো স্বর্ণ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ যুগের চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ অজন্ড়ার গুহার গায়ে দেখা যায়। গুপ্তযুগের চিত্রকলা ধর্মীয় বিষয়কে অতিক্রম করে মানুষের জীবনের নানাদিক নিয়ে রচিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের জীবনকে অবলম্বন করেও বহু প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়। অজন্তা ছাড়া বাগ গুহার চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু বিশেষ করে নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিশেষ উল্লেখ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল শিল্প বিশেষজ্ঞ গুপ্ত চিত্রকলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাধারণত রেখা বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশের ওপরেই চিত্রশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই গুপ্ত চিত্রকলা ছিল অতুলনীয়। সবকিছু মিলে সঙ্গীত, চিত্রকলা ও শিল্পকলায় গুপ্তযুগের গৌরব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গুপ্ত শাসনব্যবস্থা

কেবল সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপনই নয়, গুপ্তগণ সেই সাম্রাজ্যে সুদৃঢ়, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের কৃতিত্বেরও দাবিদার। গুপ্তদের শাসনব্যবস্থা পূর্ববর্তী ঐতিহ্য ও শাসনরীতির ধারা অনুসরণ করেই রচিত হয়। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল সুদক্ষ, জনহিতকর ও পক্ষপাতহীন। জনসাধারণের নিরাপত্তা ও মঙ্গল সম্পর্কে গুপ্ত রাজাগণ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। গুপ্ত শাসন কাঠামোয় রাজতন্ত্রের নিরংকুশ প্রাধান্য ছিল। সম্রাট পদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজাই ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন ধরনের ব্যবস্থা রাজ্যে ছিল না। তবে রাজা সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্য নিতেন। মন্ত্রীপদও অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক হয়েছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 'মহাবলাধিকৃত' (সেনাপ্রধান), 'মহাপ্রতীহার' (রাজপ্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর প্রধান), 'মহাদন্ডনায়ক' (প্রধান সেনাপতি),'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' (যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ক কর্মকর্তা) প্রমুখ গুরুত্বপুর্ণ ছিলেন।

গুপ্ত শাসন কাঠামোতে প্রাদেশিক শাসনের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'দেশ' বা 'ভূক্তি'তে বিভক্ত করা হয়েছিল। এগুলো আবার 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্নস্তরে ছিল 'গ্রাম'। গুপ্তযুগে 'বিষয়' বা জেলার শাসনে একটি উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। বিষয়ের শাসনকাজে পরামর্শ দেয়ার জন্য বিষয়ের অধিষ্ঠান অধিকরণে একটি পরিষদ থাকতো। এই পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা থাকতেন। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ সমন্বয়ে গঠিত হতো এই পরিষদ। এভাবে

শাসনকাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই অবস্থাকে গুপ্তযুগের অন্যতম গৌরব হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গুপ্ত শাসনব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিত রাজস্ব ও পুলিশ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক সংগঠন ইত্যাদি। তবে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রশংসার দিক হচ্ছে এর বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা।

গুপ্ত সংস্কৃতি : 'ধ্রুপদী' পর্ব

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গুপ্ত শাসনকাল ছিল ভারতের এক গৌরবময় যুগ। সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি এই যুগকে মহিমান্বিত করেছে। এ কারণে অনেকেই গুপ্ত সংস্কৃতি তথা গুপ্ত যুগকে 'ক্ল্যাসিক্যাল' যুগ বা 'ধ্রুপদী' যুগ বলে অভিহিত করেন। কেউ বলেন, গুপ্তযুগ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। এ সময়ে আধুনিক হিন্দু ধর্মের উত্থান ও রূপান্তর ঘটে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতন শুরু হয়। কেউ আবার গুপ্তযুগের সভ্যতাকে 'দরবারি সভ্যতা' হিসেবেও অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক বার্ণেট গুপ্ত যুগকে পেরিক্লিসের যুগের সাথে তুলনা করেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবেচনায় উভয় যুগের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

গুপ্ত যুগে ভারতের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এতে করে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে যা গুপ্ত সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করে। ঐতিহাসিক কোয়েডেস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুপ্ত শাসন ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্ত মুদ্রায়ও বহির্বিশ্বের প্রভাব দেখা যায়। এভাবে বাইরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে আদান-প্রদান গুপ্ত সংস্কৃতিকে উচ্চমার্গীয় মর্যাদা দান করেছে। বিশেষ করে গ্রিস, রোম, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈল্পিক প্রভাব গুপ্ত সংস্কৃতিকে নব-বৈশিষ্ট্য দান করেছিল।

এতদসত্ত্বেও অনেকেই গুপ্তযুগকে 'স্বর্ণযুগ' বা 'ক্ল্যাসিক্যাল যুগ' বলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রশংসার দিক থাকলেও এর ছিল কতগুলো দুর্বল দিক। প্রদেশ ও জেলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় শাসনকর্তারা ক্ষমতালোভী হয়ে পড়েন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বভারতীয় আবেদন ক্রমেই ভেঙ্গে যায়। এছাড়া নগরগুলোর ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য, উচ্চ শ্রেণীর জন্য বিনোদন সাহিত্য- লোক সংস্কৃতির অভাব-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার বিস্তার, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে উচ্চ শ্রেণীর লোকের রুচির প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে গুপ্তযুগকে প্রশ্নাতীতভাবে 'ক্ল্যাসিক্যাল যুগ' বা 'স্বর্ণযুগ' বলা চলে না। তবুও সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, গুপ্ত যুগের সামগ্রিক অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, শাসনব্যবস্থা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে গুপ্তযুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা গৌরব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

সারসংক্ষেপ

গুপ্তযুগের নানাবিধ গৌরব এই যুগকে 'ধ্রুপদী সংস্কৃতির যুগ' হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। ধর্মীয়ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র থাকলেও সাধারণভাবে উদারনীতি অনুসরণ, সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি সাধন, শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা, শিল্পকলায় উৎকর্ষ অর্জন এবং বহির্বিশ্বের সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগকে আলোকিত করেছে। এই গৌরব এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাজনৈতিক সংহতি, সুশাসন এবং গুপ্তদের সাংস্কৃতিক মহিমা সমগ্র ভারতে তো বটেই, এমনকি বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বোপরি প্রাচীন ভারতে দ্বিতীয়বারের মতো সুসংগঠিত, সুবিন্যস্ত এবং গুরুত্বপুর্ণ শাসনব্যবস্থা গুপ্তদের হাতেই রচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি কালিদাস রচিত গ্রন্থ নয়?
   (ক) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (খ) মেঘদূত
   (গ) মৃচ্ছকটিক (ঘ) মালবিকাগ্নিমিত্র

২। 'ভারতীয় নিউটন' হিসাবে পরিচিত পন্ডিতের নাম
   (ক) বাণভট্ট (খ) আর্যভট্ট
   (গ) শূদ্রক (ঘ) বরাহমিহির

৩। পাণিনি, কৌটিল্য কোন শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র ছিলেন?
   (ক) নালন্দা (খ) তক্ষশীলা
   (গ) উজ্জয়িনী (ঘ) অজন্তা

৪। 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' পদে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজ কি ছিল?
   (ক) সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন (খ) রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা বিধান
   (গ) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন (ঘ) যুদ্ধ ও সন্ধি বা শান্তি বিষয়ক দায়িত্ব পালন।

৫। গুপ্ত যুগকে কোন যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়?
   (ক) রেনেসাঁস যুগের সঙ্গে (খ) বিক্রমাদিত্যের যুগের সঙ্গে
   (গ) রোমান যুগের সঙ্গে (ঘ) পেরিক্লিসিয় যুগের সঙ্গে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। গুপ্ত যুগে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষ বর্ণনা করুন।

২। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। গুপ্ত যুগকে কেন ভারতীয় শিল্পকলার উৎকর্ষের যুগ বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গুপ্ত শাসনকালকে 'ধ্রুপদী যুগ' বলা যায় কি?

২। গুপ্ত যুগের গৌরব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar (ed.), *The History and Culture of the Indian People,* Vol III (*The Classical Age*).

২। S.R. Goyal, *History of Imperial Guptas.*

৩। P.L. Gupta, *Gupta Empire.*

৪। R.D. Banerji, *Age of the Imperial Guptas.*

৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

৬। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ৮

বাংলায় গুপ্ত শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বাংলায় গুপ্ত শাসনের ইতিহাসের উৎস সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- গুপ্তদের আদি বাসস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- বাংলায় গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

গুপ্তদের ইতিহাসের উৎস

বাংলায় গুপ্তদের শাসন সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার বেশ কিছু উপাদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে লিপি, মুদ্রা এবং সাহিত্যিক উপকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহির্দেশীয় উপাদানের মধ্যে রয়েছে চৈনিক বিবরণ। এ সকল উপাদান বাংলায় গুপ্ত শাসনের ইতিহাসকে যথেষ্ট আলোকিত করেছে। গুপ্ত আমলে উৎকীর্ণ কয়েকটি তাম্রশাসনে উত্তর বাংলায় তাদের শাসন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে প্রথম কুমার গুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসন (৪৩২-৩৩ খ্রিঃ); বৈগ্রাম তাম্রশাসন (৪৪৭-৪৮ খ্রিঃ); দামোদরপুর তাম্রশাসন (৪৪৩-৪৪ ও ৪৪৭-৪৮ খ্রিঃ); বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন (৪৭৬-৯৫খ্রিঃ); পাহাড়পুর তাম্রশাসন (৪৭৮-৭৯ খ্রিঃ) এবং বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন (৫০৭-০৮ খ্রিঃ) ইত্যাদি। এছাড়া বাকুড়ার কাছে সুসুনিয়ার পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একটি লিপি; দিল্লিতে মেহরাওয়ালী এলাকায় কুতুব মিনার সংলগ্ন কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত লৌহ স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপি; সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিলিপি; চৈনিক পর্যটক ইৎ-সিং-এর বর্ণনা; কালিদাসের 'রঘুবংশম্' এবং গুপ্তদের মুদ্রা ইত্যাদি বিখ্যাত।

গুপ্তদের আদি পরিচয়

গুপ্ত বংশের আদি পরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে নানা প্রকার বিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা বেশ কষ্টসাধ্য। শ্রীগুপ্ত হচ্ছেন গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। ঐতিহাসিক এ্যালান মনে করেন, শ্রীগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরের অদূরে রাজত্ব করতেন। কিন্তু এর বিপরীতে ডঃ ডি.সি. গাঙ্গুলী বলেন, গুপ্তদের আদি রাজত্ব ছিল বাংলার মুর্শিদাবাদে। ডঃ গাঙ্গুলী ইৎ-সিং-এর বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাঁর মতবাদ গঠন করেন। ইৎ-সিং ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। এর পাঁচশত বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চীনা পরিব্রাজক হুই লুন নালন্দা পরিদর্শনে যান। সে সময় মহারাজা শ্রীগুপ্ত 'মৃগশিখাবন' নামে একটি মন্দির চীনা পুরোহিতদের জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই মন্দিরের ব্যয়-সংকুলানের জন্য ২৪টি গ্রামও দান করেছিলেন। মৃগশিখাবন মন্দিরটি নালন্দা হতে চল্লিশ যোজন পূর্বদিকে অবস্থিত। গঙ্গার গতিপথ ধরে চল্লিশ যোজন দূরত্বে মুর্শিদাবাদের অবস্থান। এভাবে ইৎ-সিং-এর বিবরণের দূরত্ব ও দিক বিচারে গাঙ্গুলী গুপ্তদের আদি বাসস্থান বাংলার মুর্শিদাবাদে ছিল বলে মন্তব্য পেশ করেন।

ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অন্য একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, নেপালে একটি স্তুপের গায়ে 'বরেন্দ্রীর মৃগশিখাবন স্তুপ' লেখা আছে। এ থেকে তিনি অনুমান করেন, বরেন্দ্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ গুপ্তরাজগণের মূল বাসস্থান ছিল। এদিকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ১০১৫ খ্রিস্টাব্দের একটি বৌদ্ধ পান্ডুলিপিতে একটি চিত্রের নিচে প্রদত্ত লেবেলে 'বরেন্দ্রীর মৃগস্থাপন স্তুপ' শব্দটি লেখা আছে। এ থেকেও প্রমাণ হয় গুপ্তদের আদি নিবাস ছিল সম্ভবত বরেন্দ্র অঞ্চলে। এভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অথবা উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রে গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল বলে অনুমিত হয়। অনেকে এ কারণে গুপ্ত রাজগণের আদি পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তাদেরকে 'বাঙালি' হিসেবে মন্তব্য করেন। তবে মনে রাখতে হবে এ বিষয়ক সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো নির্ভরযোগ্য প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন তখন বাংলায় সমতট, বঙ্গ, পুষ্করণ ইত্যাদি রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। সুসুনিয়া লিপিতে পুস্করণাধিপ সিংহবর্মা ও তাঁর পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাই খুব সম্ভবত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা।

মেহরাওয়ালী স্তম্ভলিপির বক্তব্য বাংলায় গুপ্তদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের ইতিহাসে কিছু আলোকপাত করে। এই লিপিতে চন্দ্র নামধারী এক রাজার বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর অন্যান্য বিজয়ের সাথে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বঙ্গে শত্রু নিধনে গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং বঙ্গীয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিল। এই লিপিতে উল্লিখিত রাজা চন্দ্র কে এবং কোথায় রাজত্ব করতেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে গুপ্তবংশীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলে সনাক্ত করেছেন। যদি প্রথম অনুমান ঠিক হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, সমুদ্রগুপ্তের পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তই বঙ্গ অঞ্চল (সমগ্র বাংলা নয়) গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। যদি দ্বিতীয় অনুমান (অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) ঠিক হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ জয়ের পরও তাঁর পুত্রকে অত্র অঞ্চল পুনর্বার জয় করতে হয়েছিল। আবার 'চন্দ্র' যদি নাম না হয়ে দেহ-সুষমা বর্ণনার উপমা হয়ে থাকে তবে তা সমুদ্রগুপ্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। উপরোক্ত সব সিদ্ধান্তই আনুমানিক। তবে উক্ত আলোচনা হতে অন্তত এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গুপ্ত যুগের প্রাক্কালে বা প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য ছিল যারা সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতো।

গুপ্ত শাসনের প্রাক্কালে বাংলার কোন অংশ তাঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও সমুদ্রগুপ্ত যে বাংলার অধিকাংশ এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন– সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর রাজ্যজয়ের যে বিবরণ আছে তা হতে এ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। সমুদ্রগুপ্ত যে বাংলার সমতট ব্যতিত অন্য সব জনপদই সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন তাও এই প্রশস্তি সূত্রে জানা যায়। তাঁর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক এবং সমতট। সমতট, অর্থাৎ বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল সম্ভবত গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ছিল। তবে কালক্রমে এ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, ষষ্ট শতাব্দীর প্রথম দিকে (৫০৭-০৮খ্রি:) এখানে বৈন্যগুপ্ত নামে গুপ্তবংশীয় একজন রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার কতকস্থান এক দানপত্র সম্পাদন করে তাঁরই একজন অনুগত ব্যক্তিকে প্রদান করেছিলেন বলে তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। বৈন্যগুপ্ত 'দ্বাদশাদিত্য', 'মহারাজ', 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিও ধারণ করেছিলেন।

সে যাহোক, সমগ্র উত্তর বাংলা যে গুপ্তদের সরাসরি অধীন ছিল পরবর্তীকালের তাম্রশাসনসমূহে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। প্রাপ্ত তাম্রশাসন হতে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর বাংলা দীর্ঘকাল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এ অঞ্চলে গুপ্ত প্রাদেশিক শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল পুন্ড্রনগর (পরবর্তীকালের মহাস্থান, বর্তমানের বগুড়া)।

এখানে গুপ্তদের সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত ছিল একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার ওপর।

বাংলায় গুপ্ত শাসনব্যবস্থা

গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক শাসিত বাংলা অঞ্চলে কতগুলো প্রশাসনিক বিভাগ ছিল, যেমন 'ভুক্তি', 'বিষয়', 'মন্ডল', 'বীথি' ও 'গ্রাম'। এ সকল প্রশাসনিক ভাগের প্রত্যেকটির একটি করে প্রধান কেন্দ্র বা 'অধিষ্ঠান' ছিল এবং সেখানে ছিল একটি 'অধিকরণ'। 'ভুক্তি' ছিল সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক বিভাগ এবং আধুনিককালের 'বিভাগ' এর অনুরূপ। সম্রাটের একজন প্রতিনিধি ভুক্তি শাসন করতেন। সমসাময়িক লিপিমালায় 'পুন্ড্রবর্ধন' (সমগ্র উত্তরবঙ্গ) ও 'বর্ধমান' (প্রাচীন রাঢ়ের দক্ষিণাংশ) নামে দুটি ভুক্তি ছিল বলে জানা যায়। গুপ্তযুগের শিলালিপিতে নামবিহীন এক ভুক্তিরও উল্লেখ আছে। এর সদর দপ্তর ছিল 'নব্যবকাশিকা'। 'সুবর্ণবীথি' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের দামোদরপুর তাম্রশাসনে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তাকে সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করে 'তৎপাদপরিগৃহীত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম কুমারগুপ্তের সময় ভুক্তি প্রশাসককে 'উপরিক' এবং বুধগুপ্তের সময় 'মহারাজ উপরিক' বলা হতো। পাহাড়পুর তাম্রশাসন (৪৭৯ খ্রিঃ) থেকে জানা যায় যে, পুন্ড্রবর্ধন শহরে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির 'অধিকরণ' (সদর দপ্তর) অবস্থিত ছিল। ভুক্তির পরবর্তী প্রশাসনিক বিভাগের নাম 'বিষয়'। বিষয় দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রশাসনিক ইউনিট এবং শাসনক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ছিল অনেকটা আধুনিক যুগের জেলার অনুরূপ। বিষয়ের শাসনকর্তাকে প্রথমদিকে বলা হতো 'কুমারমাত্য' এবং গুপ্তযুগের শেষদিকে 'আয়ুক্তক'। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বিষয় প্রধানকে 'বিষয়পতি'ও বলা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়পতিকে স্বয়ং সম্রাট সরাসরি নিয়োগদান করতেন। তবে মূলত ভুক্তির শাসনকর্তাই ছিলেন এ পদের নিয়োগদাতা। গুপ্ত তাম্রশাসন থেকে কয়েকটি বিষয়-এর নাম জানা যায় 'যেমন, 'কোটিবর্ষ-বিষয়', খোদাপাড়া বিষয়', 'পঞ্চনগরী বিষয়', 'বরাকমন্ডল বিষয়' এবং 'ঔদম্বরিক বিষয়' ইত্যাদি। দামোদরপুর তাম্রশাসনের বিবরণ হতে এটা স্পষ্ট যে বিষয়-এর সদর দফতরে (অধিষ্ঠান-অধিকরণম্) 'পুস্তপাল' (দলিল-রক্ষক) নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। এরা ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দান সংক্রান্ত কার্যাবলী ছাড়াও নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতেন। কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতির সহায়করূপে এক উপদেষ্টামন্ডলীর কথা জানা যায়। সেকালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী চারজন সদস্য ও স্বয়ং বিষয়পতির সমন্বয়ে এই উপদেষ্টামন্ডলী গঠিত হতো। এ উপদেষ্টা সভার সদস্যরা ছিলেন 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'প্রথম-সার্থবাহ', 'প্রথম-কুলিক' এবং 'প্রথম-কায়স্থ'। 'নগর শ্রেষ্ঠী' ছিলেন শহরের বিভিন্ন গিল্ড বা কর্পোরেশনের অথবা ধনী ব্যাংকারদের সংস্থার সভাপতি। 'প্রথম-সার্থবাহ' ছিলেন বণিক সম্প্রদায় বা বিভিন্ন ব্যবসায়িক গিল্ডের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান ব্যবসায়ী। 'প্রথম-কুলিক' ছিলেন বিভিন্ন কারিগর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান কারিগর এবং 'প্রথম-কায়স্থ' ছিলেন কায়স্থ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান করণিক অথবা বর্তমানকালের অফিস সচিব ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী। এভাবে জেলার প্রশাসনে বিভিন্ন উপদেষ্টামন্ডলীর বর্ণনা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রশাসনে স্থানীয় জনগণের সংযোগ ছিল এবং স্থানীয় প্রশাসনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল।

'বিষয়' বা জেলার পরবর্তী প্রশাসনিক বিভাগ ছিল 'বীথি'। 'বীথি' শব্দটির প্রকৃত অর্থ অস্পষ্ট। কিছুসংখ্যক লিপিতে এই প্রশাসনিক ইউনিটের উল্লেখ আছে। নব্যবকাশিকায় অবস্থিত সুবর্ণবীথিকে 'স্বর্ণবাজার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বীথির উল্লেখ মল্লসারুল তাম্রশাসনেও আছে। এই একই লিপিতে কোন বিষয়-এর উল্লেখ ছাড়াই বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বক্কটক্কবীথির নাম পাওয়া যায়। পাহাড়পুর তাম্রশাসনে দক্ষিণাংশক বীথিকে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। এই তাম্রশাসনে বীথ্যধিকরণের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও কীভাবে এ অধিকরণ গঠিত হতো তা সঠিকভাবে বলা হয়নি। ভূমি দান-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বীথ্যধিকরণের দায়িত্ব ছিল বিষয়াধিকরণের অনুরূপ। বীথির অধিকরণকে সহায়তা দানের জন্য বিশিষ্ট লোকদের সমন্বয়ে একটি পরিষদ থাকতো। বীথির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের

মধ্যে 'মহত্তর', 'অগ্রহরীন', 'খড়্গী' (অসিযোদ্ধা) এবং অন্ড়তপক্ষে একজন 'বহনায়ক' (যানবাহন তত্ত্বাবধায়ক) মিলে এই পরিষদ গঠিত হতো।

'গ্রাম' ছিল সেকালের সবচাইতে ছোট প্রশাসনিক ইউনিট। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরাই গ্রাম-প্রশাসন ও স্থানীয় ব্যাপারে জড়িত থাকতেন। বিষয় ও বীথি অধিকরণের মতো গ্রাম শাসনযন্ত্রেও 'মহত্তর' ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গ্রামেই যে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে 'গ্রামিক' ছিলেন তা পুরোপুরি প্রমাণ করা যায় না। পাহাড়পুর লিপিসাক্ষ্যে জানা যায় যে, 'ব্রাহ্মণ', 'মহত্তর', 'কুটুম্বী' ছিলেন গ্রামের প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তি। গ্রামগুলোতে ভূমি দান-বিক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি সংরক্ষণের একটি কার্যালয় থাকতো। গ্রাম-অধিকরণের যথার্থ গঠন বিভিন্ন সময় সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছিল।

গুপ্ত যুগের ভূমি ব্যবস্থাও ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। লিপি সাক্ষ্যে 'ক্ষেত্র', 'খিল' ও 'বাস্তু' ভূমির প্রমাণ পাওয়া যায়। চাষযোগ্য জমিই 'ক্ষেত্র', অনুৎপাদনশীল পতিত জমি 'খিল' এবংবসবাসযোগ্য জমি 'বাস্তু'। 'খিল' জমির বর্ণনায় 'অপ্রদ' (অনুৎপাদনশীল), অপ্রহত (অকর্ষিত জমি) ও খিল (পতিত জমি) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্ত আমলে ভূমির যথার্থ পরিমাপের ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য বাংলার সর্বত্র ভূমির পরিমাপ একই ধরনের ছিল না। এ সময় ভূমির পরিমাপের একক ছিল 'কূল্যবাপ' ও 'দ্রোণবাপ'। এক কূল্য পরিমাপের বীজ দ্বারা যে পরিমাণ জমি বপন করা যায় 'কূল্যবাপ' শব্দ দ্বারা সাধারণত ঐ পরিমাণ জমিকে বোঝাতো। অন্যদিকে কূল্যবাপের আটভাগের একভাগকে 'দ্রোণবাপ' বলা হতো। পন্ডিতগণ মোটামুটিভাবে ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, এক কূল্যবাপ সমান বর্তমানের তিন বিঘা জমির মতো হতে পারে। লিপিমালায় ভূমি পরিমাপের একক হিসেবে আরও কিছু শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন 'পাটক' বা 'ভূ-পাটক', 'আঢক', 'কাকিনি', 'খাদিক', 'হাল', 'দ্রোণ' ইত্যাদি।

লিপিমালাভিত্তিক উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, গুপ্তযুগে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। গুপ্ত আমলে বাংলায় প্রচলিত শাসনব্যবস্থা যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত ছিল তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। স্থানীয় জনগণ এ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। সুতরাং বাংলার শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কৃতিত্ব গুপ্ত সম্রাটদেরই প্রাপ্য। লিপিমালাসূত্রে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার যে বিন্যাস চিত্র দেখা যায় তাঁকে বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আদি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং বাংলায় প্রশাসনিক ইতিহাসে এর গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় গুপ্ত শাসনের ইতিহাস জানার জন্য তাম্রশাসনই প্রধান উৎস। অবশ্য এ অঞ্চলে গুপ্ত মাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ সম্পর্কে অপরাপর কিছু উৎসেও তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয় আদি পরিচয়ে গুপ্তরা ছিলেন বাঙালি। সম্ভবত বাংলার মুর্শিদাবাদ অথবা উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। গুপ্ত সম্রাটগণ যখন বাংলার দিকে সরাসরিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন তখন স্থানীয় শক্তি তাঁদের বিরোধীতা করেন। গুপ্তরা বাংলায় শত্রু নিধনে গৌরব অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয়েরা সম্মিলিত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিল। উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় গুপ্তদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রচলিত ছিল। সমতট অঞ্চল ছিল সম্ভবত করদরাজ্য। বাংলায় শাসন কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুপ্তদের অবদান দৃষ্টান্তমূলক। সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে গুপ্তরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন প্রশাসনিক ইউনিটগুলো হচ্ছে ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল, বীথি ও গ্রাম। প্রত্যেকটি ইউনিটের আবার পৃথকভাবে অধিষ্ঠান-অধিকরণ বা সদর দপ্তর ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল।বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করা হতো। তারা শাসনকাজে ভূমিকা রাখতেন। এভাবে

স্থানীয় প্রশাসনে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির অনুসরণ সেকালেই শুরু হয়। এ ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের আদি নজির হিসেবেও উল্লেখ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(√) চিহ্ন দিন।

১। দিল্লিতে লৌহ স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপিটির নাম–
(ক) মেহ্‌রাওয়ালী স্তম্ভলিপি (খ) বাদল স্তম্ভলিপি
(গ) এলাহাবাদ প্রশস্তি (গ) সুসুনিয়া লিপি

২। কোনটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাজ্য নয়?
(ক) সমতট (খ) কামরূপ
(গ) ডবাক (ঘ) নালন্দা

৩। 'পুন্ড্রনগর' কোথায় অবস্থিত?
(ক) বাকুড়া (খ) বগুড়া
(গ) কুমিল্লা (ঘ) কামরূপ

৪। ভুক্তির অধিপতিকে বলা হতো–
(ক) আযুক্তক (খ) কুমারমাত্য
(গ) মহারাজ উপরিক (ঘ) ভুক্তি-সম্রাট

৫। 'প্রথম-সার্থবাহ' কে ছিলেন?
(ক) ধনী ব্যাংকারদের সংস্থার সভাপতি (খ) প্রধান কারিগর
(গ) প্রধান করণিক (ঘ) বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান ব্যবসায়ী

৬। 'অপ্রহত' কোন জমিকে নির্দেশ করে?
(ক) অনুৎপাদনশীল জমিকে (খ) পতিত জমিকে
(গ) অকর্ষিত জমিকে (ঘ) বসবাসের জমিকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। গুপ্তযুগের আদি পরিচয় নির্ণয়ে মৃগশিখাবন মন্দিরের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। গুপ্ত যুগের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপর একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় গুপ্তদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার উৎস কি কি? গুপ্তরা কি আদি পরিচয়ে 'বাঙালি' ছিলেন?
২। বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের বিবরণ দিন।
৩। বাংলায় গুপ্ত শাসনব্যবস্থার চিত্র অংকন করুন এবং এই ব্যবস্থার গুরুত্বের ওপর মন্তব্য করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*
২। R.C. Majumdar (ed.), *History of Bengal,* Vol-I.
৩। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ৯

শশাঙ্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- গুপ্ত পরবর্তী সময়ে বাংলা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- শশাঙ্কের ইতিহাসের উৎস জানতে পারবেন ;
- উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে শশাঙ্কের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- শশাঙ্কের সামগ্রিক কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

গুপ্ত পরবর্তীকালে বাংলা

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে আবারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজশক্তির উদ্ভব হয়। এই অবস্থার প্রভাব বাংলায়ও পড়ে। সমসাময়িক অবস্থার সুযোগে বাংলায় তখন দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর একটি ছিল প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য এবং অপরটি গৌড় রাজ্য। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে ছিল স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য ও পশ্চিম ও উত্তর বাংলাব্যাপী ছিল স্বাধীন গৌড় রাজ্য। শশাঙ্ক এই গৌড় রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন।

প্রাপ্ত সাতটি তাম্রশাসন থেকে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন রাজা সম্পর্কে জানা যায় যারা ৫২৫ খ্রিঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃ-এর মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া, বর্ধমান জেলার মল্লসারুল এবং বালেশ্বর জেলার জয়রামপুরে তাম্রশাসনগুলো পাওয়া গেছে। বঙ্গের রাজাগণ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন যা তাঁদের সার্বভৌম ক্ষমতারই পরিচায়ক। যাহোক প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহ থেকে উল্লিখিত তিনজন রাজা ও তাদের রাজ্যের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বঙ্গ রাজ্যের ধ্বংস বা পতন কি করে হয়েছিল তা জানা যায় না। বহির্শক্তির আক্রমণে অথবা স্বাধীন গৌড় রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধিতে বঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হতে পারে।

বঙ্গের পর গৌড় রাজ্যের কথায় আসা যাক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলায়, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশে ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। বাংলার এ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল স্বাধীন গৌড় রাজ্য। উত্তর ভারতের 'মৌখরী' রাজবংশ এবং পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী পুরুষানুক্রমিক বিবাদ চলছিল। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন শশাঙ্ক। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন সার্বভৌম গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্কের ইতিহাসের উৎস

শশাঙ্ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় এরকম কিছু উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে। এর মধ্যে শশাঙ্কের তাম্রশাসন, মুদ্রা, রোহতাসগড় গিরিগাত্রে প্রাপ্ত সিলের ছাঁচ; 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' ও বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' শীর্ষক গ্রন্থ এবং চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ উল্লেখযোগ্য। শশাঙ্কের ইতিহাসের উৎসসমূহের মধ্যে 'হর্ষচরিত' এবং হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা থেকে তথ্য নেবার ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা, এ দুটি উৎসে শশাঙ্ক 'বিরোধী পক্ষ' বা 'শত্রুপক্ষ' হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।

শশাঙ্কের উত্থান এবং রাজ্যসীমা

শশাঙ্কের উত্থান ঠিক কোন্ সময়ে হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে মনে হয়, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে শশাঙ্কের উত্থান ঘটে। এ সময় ভারতবর্ষের সামগ্রিক চিত্রে আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাজার উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে নৈমিত্তিক কলহ। হুণদের আক্রমণে গুপ্তদের পতনের পর থেকেই এ দৃশ্যের অবতারণা হয়। যাহোক, বাণভট্টসূত্রে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীর শুরুতেই (৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) হর্ষবর্ধন শপথ গ্রহণ করেন এবং হর্ষবর্ধনের শপথ গ্রহণের পূর্বে শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয়। এদিকে গঞ্জাম তাম্রশাসনে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় 'গৌড়াধিপতি' শশাঙ্কের সদর্প উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের পর যখন বাংলায় ভ্রমণে আসেন তখন শশাঙ্ক আর বেঁচে নেই। যে কারণে হিউয়েন সাং-এর বিবরণে শশাঙ্কের মৃত্যু সম্পর্কিত 'কাহিনী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত নৃপতি। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অবশ্যই রাজত্ব করেছেন এবং সম্ভবত ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শশাঙ্কের উত্থানের সময় পশ্চিমে (মালব) পরবর্তী গুপ্তরা শাসন করছিলো। উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে মৌখরী রাজবংশ এবং উত্তর প্রদেশের সীমানায় অর্থাৎ পূর্ব পাঞ্জাবে থানেশ্বরকে কেন্দ্র করে পুষ্যভূতি রাজবংশের শাসন চলছিল।

এ কথাটি স্পষ্ট যে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন এক সময়ে শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যে ক্ষমতাসীন হন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'রাঙ্গামাটি'। বাংলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ শশাঙ্কের রাজ্যাধীন ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এ কারণে শশাঙ্ক সমগ্র বাংলার অধিপতি ছিলেন– এ ধরনের মন্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। শশাঙ্কের রাজত্বের প্রথম হতেই মগধ বা দক্ষিণ বিহার অঞ্চল তাঁর অধিকারে ছিল। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের গঞ্জাম তাম্রশাসন হতে প্রমাণ হয় শশাঙ্কের রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে শশাঙ্কের হস্তক্ষেপ

উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ শশাঙ্কের শাসনামলের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৎকালীন ভারতের শক্তিশালী সম্রাট হর্ষবর্ধন। যাহোক, শশাঙ্কের উত্থানের পূর্বে উত্তর ভারতের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 'মৌখরী' রাজবংশ পূর্ব ও পশ্চিমে সাম্রাজ্য বিস্তারের আগ্রাসী অভিলাষে লিপ্ত। তারা সমসাময়িক অপর শক্তি 'পুষ্যভূতি' রাজবংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে 'জোট' গড়ে তুলেছিল। এদিকে শশাঙ্ক এই জোটের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করার জন্যই প্রধানত উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। গৌড়-মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের সাথে মৌখরীরাজাদের বংশানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। গৌড়-মগধের অধিকর্তা শশাঙ্ককে এই শত্রুতার জের টানতে হয়। তাছাড়া সমসাময়িক সময়ের কনৌজের মৌখরী রাজা গ্রহবর্মণ পুষ্যভূতি রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। শশাঙ্ক ধারণা করেন, এই বন্ধুত্ব তাঁর জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে। ফলে তিনিও কূটনৈতিক কৌশলে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। এরপর 'সর্বভারতীয়' শক্তির বিরুদ্ধে শশাঙ্ক বাংলার শক্তি প্রদর্শনে অগ্রসর হন।

উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে শশাঙ্কের জড়িত হবার পেছনে মোটামুটিভাবে দুটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের সাথে মৌখরীদের দ্বন্দ্বে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কও জড়িত হয়ে পড়েন। কেননা অনেকেই মনে করেন শশাঙ্ক গুপ্ত রাজাদেরই কোন সামন্তরাজা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাই উত্তরাধিকার সূত্রেই হয়তো তিনি মৌখরীদের শত্রু ছিলেন। দ্বিতীয়ত, পরস্পর বিরোধী দুটি জোট গড়ে ওঠায় উত্তর ভারতের রাজনীতি বেশ জটিল আকার ধারণ করে। এর মধ্যে একটি জোটের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি

হিসেবে শশাঙ্ক নিজেকে 'সর্বভারতীয়' রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলেন। মৌখরী এবং পুষ্যভূতিদের জোটের বিরুদ্ধে শশাঙ্ক মালবের দেবগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে এভাবেই মৈত্রী জোট গড়ে তোলেন।

পুষ্যভূতি ও মৌখরী মিত্রশক্তির আক্রমণের পূর্বেই থানেশ্বর রাজ প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতার সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণকে আক্রমণ করেন এবং তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দি করেন। এ যুদ্ধে গ্রহবর্মণকে পরাজিত করার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবগুপ্ত শশাঙ্কের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করেই পরবর্তী পর্যায়ে থানেশ্বর রাজ্য আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এদিকে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর থানেশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন রাজ্যবর্ধন। রাজ্যবর্ধন গ্রহবর্মণের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে বিচলিত হন এবং নিজ ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য সসৈন্যে কনৌজের দিকে যাত্রা করেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বেশ অস্পষ্ট। তবে প্রাপ্ত উৎস বিশে- ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্ড়ু কনৌজের ওপর তিনি নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সম্ভবত ব্যর্থ হন এবং ভগ্নী রাজ্যশ্রীকেও উদ্ধার করতে তেমন একটা সাফল্য পাননি। শশাঙ্ক সম্ভবত আগেই সসৈন্যে কনৌজ পৌঁছেছিলেন দেবগুপ্তের সাহায্যের জন্য। শশাঙ্ক এবং রাজ্যবর্ধনের মধ্যে সরাসরি কোন যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে শশাঙ্ক যে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন তার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। এ সম্পর্কে সমসাময়িক সূত্রগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাং উভয়েই তাঁদের লেখনিতে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করার পেছনে শশাঙ্কের ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা সক্রিয় ছিল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে বিষয়টি বেশ ঘোলাটে। বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিখেছেন যে, 'গৌড়ের রাজার মিথ্যা উপাচারে আশ্বস্ত হয়ে নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকী গৌড়ের রাজার ভবনে গমন করেন এবং তৎকর্তৃক নিহত হন।' রাজ্যবর্ধন নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে শত্রুর কাছে কেন গিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা বাণভট্টের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। অবশ্য হর্ষচরিতের টীকাকার চতুর্দশ শতাব্দীর শংকর, শশাঙ্ক কর্তৃক নিজ কন্যাকে রাজ্যবর্ধনের কাছে বিবাহের প্রলোভনের কথা উল্লেখ করে এর একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন আসে, প্রায় সাতশত বছর পর এ ধরনের প্রলোভনের কথা শংকর পেলেন কোথায়? হিউয়েন সাং-এর বিবরণের এক স্থানে পাওয়া যায়, শশাঙ্কের মন্ত্রীগণ রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীগণের দোষেই রাজ্যবর্ধন শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন। তৃতীয় একটি উৎস হিসেবে হর্ষবর্ধনের একটি শিলালিপিতে প্রাপ্ত তথ্যকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে, 'সত্যানুরোধে' (সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বা প্রতিজ্ঞা রক্ষাকল্পে) রাজ্যবর্ধন শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এই তিনটি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনেকে বলার চেষ্টা করেন যে, শশাঙ্ক একজন 'বিশ্বাসঘাতক'। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং কেউই শশাঙ্কের স্বপক্ষীয় নয়। সুতরাং তাদের উক্তি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্যও নয়। তাছাড়া উক্তিগুলোর মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুমান, কনৌজের দিকে অগ্রসর হবার পথে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের সাথে সম্মুখযুদ্ধেও পরাজিত হতে পারেন। অথবা তাঁর মন্ত্রীবর্গের ষড়যন্ত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এমনও মনে করা যেতে পারে। রাজ্যবর্ধনের এই 'পরাজয়' ও 'মৃত্যু'র বিষয়টি তাঁর স্বপক্ষীয় লেখকরা হয়তো কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার সাথে যে কোন ভাবেই হোক শশাঙ্ক যে জড়িত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন বাংলার একজন নৃপতি হিসেবে শশাঙ্ক ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী।

হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে শশাঙ্ক

প্রাচীন ভারতে হর্ষবর্ধনকে বলা হয় তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ। এই শক্তিশালী সম্রাটের বিরুদ্ধেও শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব অক্ষুন্ন ছিল। শশাঙ্কের ইতিহাসে সবচাইতে বড় ঘটনা সম্ভবত এটাই। যাহোক, শশাঙ্কের সাথে হর্ষবর্ধনের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি না তা নিশ্চিত করে জানার উপায় নেই। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে এ বিষয়ে সামান্য কিছু উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত নয়। এটি কেবল বৌদ্ধ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তীর সমাহার। তদুপরি এ গ্রন্থে রয়েছে

আদ্যক্ষরজনিত সমস্যা। অর্থাৎ এতে উল্লিখিত সব নামই হয় নামের প্রথম অক্ষর বা সমার্থক শব্দ দ্বারা লেখা। যেমন– রাজা 'সোম' সম্ভবত শশাঙ্ক এবং তাঁর শত্রু রাজা 'হ' ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা 'র' সম্ভবত যথাক্রমে হর্ষবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন। এ গ্রন্থে হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের পরাজয়ের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থের বর্ণনা এ কারণেই গ্রহণযোগ্য নয় যে– শশাঙ্ক সত্যিই পরাজিত হলে বাণভট্ট বা হিউয়েন সাং অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের গঞ্জম লিপি থেকে প্রমাণ হয় শশাঙ্ক ততোদিন পর্যন্ত নিজ রাজ্যে অক্ষুন্ন ছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করে হয়তো কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। আর হিউয়েন সাং-এর বিবরণ হতে মনে হয় শশাঙ্ক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্তও নিজ রাজ্যে বিরাজমান ছিলেন। যে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন; যিনি ক্ষমতায় বসেই তাঁর ভ্রাতৃহন্তাকারী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে 'পৃথিবীকে গৌড়শূন্য করবেন' বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; যিনি কামরূপের ভাস্কর বর্মণের সাথে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে মিত্রতা গড়ে তুলে তাঁকে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিলেন; সেই হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের জীবদ্দশায় সম্ভবত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করতে পারেন নি। উভয়দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়েও শশাঙ্ক আমৃত্যু গৌড়রাজ্য তথা বাংলার স্বাধীন সত্তা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হন। কেননা আমরা দেখি যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই ভাস্করবর্মণ এবং হিউয়েন সাং বাংলায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শশাঙ্কের ধর্মমত

শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় শিবের মূর্তি উৎকীর্ণ করা হতো। হিউয়েন সাং শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ ও বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের নানান কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বাণভট্ট শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম', 'গৌড়ভুজঙ্গ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। শশাঙ্ক শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এটা হয়তো বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার কিছুটা রোধ করেছিল। তাই অনেকেই মনে করেন, শশাঙ্কের বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনীর মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। কেননা হিউয়েন সাং বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে প্রমাণ করা মুশকিল যে, শশাঙ্ক ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ নিধন করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যু প্রসঙ্গে হিউয়েন সাং বলেন, '৬৩০ খ্রিস্টাব্দের অল্পকাল পূর্বে শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন এবং নিকটবর্তী মন্দির হতে বুদ্ধ মূর্তি সরিয়েছিলেন। এর ফলে শশাঙ্কের সারা দেহে ক্ষত হয়, মাংস পঁচে যায় এবং তাঁর মৃত্যু হয়।' এ বিবরণ 'বিদ্বেষপ্রসূত' বলেই মনে হয় এবং এর ভিত্তিতে শশাঙ্ককে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই শশাঙ্ককে বাংলার 'প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নৃপতি' হিসেবে আখ্যা দিতে চান। এর স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও দেয়া যেতে পারে। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'শশাঙ্ক তাঁর রাজ্য জয় দ্বারা যে নীতির পত্তন করেন তা অনুসরণ করে পাল রাজারা বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।' বাস্তবিকই শশাঙ্কই প্রথম রাজব্যক্তিত্ব যিনি বাংলার গৌরবময় অস্তিত্বের সংবাদ সর্বভারতে ছড়িয়ে দেন। সর্বভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার প্রকাশ এবং বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখার কৃতিত্ব শশাঙ্কের নেতৃত্বেই ঘটেছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায়, শশাঙ্কই বাংলার প্রথম নৃপতি যাঁর ভূমিদান করার মতো এবং মুদ্রা প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা ছিল। তিনি বাংলার শক্তি নিয়ে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং কিছু সাফল্যও ছিনিয়ে আনেন। এভাবে সপ্তম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক, বলা যায় অনেকটা আকস্মিকভাবেই কৃতিত্বের আলো ছড়িয়ে দেন। সার্বিক বিচারে তাই তাঁকে বাংলার 'প্রথম গুরুত্বপুর্ণ নৃপতি' হিসাব মেনে নেয়া যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নৃপতি শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শাসক। গুপ্ত শাসনের পর বাংলার গৌড় রাজ্যের তিনি অধিপতি হন। তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্‌কা হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। 'মৌখরী' এবং 'পুষ্যভূতি' বংশের বিরুদ্ধে তিনি বাংলার স্বাধীন সত্তা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হন। এমনকি উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তিনি বাংলার পক্ষে কিছু সাফল্যও অর্জন করেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন এবংকূটনৈতিক দক্ষতায় তিনি নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। শশাঙ্কই বাংলার প্রথম নৃপতি যার ভূমিদান করার মতো এবংমুদ্রা প্রকাশ করার মতো স্বাধীন ক্ষমতা ছিল। রাজ্যবর্ধনের হত্যাকান্ডের সাথে তাঁর সম্পৃক্ত থাকার বেশ কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যা শশাঙ্কের কৃতিত্বকেই নির্দেশ করে। বাংলার সদর্প রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংবাদ সর্বভারতে প্রচার করার গৌরবে শশাঙ্ক মহিমান্বিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। কনৌজের কোন রাজবংশ শশাঙ্কের বিরোধীতা করে?

(ক) পুষ্যভূতি (খ) মৌখরী

(গ) পরবর্তী গুপ্ত (ঘ) চন্দ্র

২। শশাঙ্কের আমলে কোন দুটি জোট উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েওঠে?

(ক) মৌখরী-পুষ্যভূতি ও গৌড়-মালব

(খ) মৌখরী-মালব ও গৌড়-পুষ্যভূতি

(গ) পুষ্যভূতি-গৌড় ও মৌখরী-মালব

(ঘ) পুষ্যভূতি-মালব ও গৌড়-মৌখরী

৩। কোন সম্রাটের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে শশাঙ্ককে সম্পৃক্ত করা হয়?

(ক) হর্ষবর্ধন (খ) প্রভাকরবর্ধন

(গ) রাজ্যবর্ধন (ঘ) ভাস্করবর্মণ

৪। আদ্যাক্ষরজনিত জটিলতা কোন গ্রন্থটিতে বিদ্যমান?

(ক) হর্ষচরিত (খ) রামচরিতম্‌

(গ) রাজতরঙ্গিনী (ঘ) আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প

৫। শশাঙ্ক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

(ক) বৌদ্ধ (খ) বৈষ্ণব

(গ) শৈব (ঘ) জৈন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। গুপ্ত পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করুন।

২। শশাঙ্ক সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। শশাঙ্ক সম্পর্কে জানার উৎসগুলো কি? শশাঙ্কের উত্থান ও রাজ্যসীমা চিহ্নিত করুন।

২। উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের বিশেষ উল্লেখপূর্বক শশাঙ্কের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করুন।

৩। 'শশাঙ্ক প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি'– আপনি কি একমত?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*

২। R.C. Majumdar (ed.), *History of Bengal,* Vol-I.

৩। আবদুলমমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ১০

হর্ষবর্ধন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- হর্ষবর্ধনের ইতিহাসের উৎস সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যসীমা সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- প্রাচীন ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট হিসেবে হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

পুষ্যভূতি বংশের পরিচয় ও উত্থান

প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশ পূর্বপাঞ্জাবের পুষ্যভূতি রাজবংশ। শশাঙ্কের ওপর আলোচনাকালে পুষ্যভূতিদের সম্পর্কে কিছু ধারণা ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বর অঞ্চলে সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুষ্যভূতি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপুর্ণ শাসক ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। পুষ্যভূতি রাজাদের নামের শেষে 'বর্ধন' শব্দটি যুক্ত করে একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপন করা হয়েছে। প্রভাকরবর্ধন ছিলেন খুবই প্রতাপশালী রাজা। হূন আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি পাঞ্জাব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে যে ঐক্যহীন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তার অবসানে পুষ্যভূতি বংশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রভাকরবর্ধনের নেতৃত্বে পুষ্যভূতিরা ভারতে চতুর্থবারের মতো এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। প্রাচীনকালে ভারতে রাজবংশগুলোর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের রীতি ছিল।এ ধরনের বিবাহের ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব। আপনারা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছেন যে, সমকালীন যুগধর্ম অনুসারে প্রভাকরবর্ধনও কনৌজের মৌখরী বংশের সাথে বৈবাহিক সূত্রে মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরী রাজপুত্র গ্রহবর্মণের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রী জোট গড়ে ওঠে। এই মৈত্রী জোটের বিরুদ্ধে মালবের দেবগুপ্ত এবং গৌড়রাজ শশাঙ্ক পাল্টা মিত্রতা গঠন করেন। প্রভাকরবর্ধন যতোদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন এই দুই পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করেনি। কিন্তু আকস্মিকভাবে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেন। এদিকে মালব-গৌড় শক্তি জোট থানেশ্বরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। তাদের হাতে গ্রহবর্মণ নিহত হন এবং বন্দি হন রাজকন্যা রাজ্যশ্রী। রাজ্যবর্ধন বোনকে উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং দেবগুপ্তকে হত্যা করেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হন বলে সমসাময়িক উৎসে উল্লেখ পাওয়া যায়। শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে ন্যায্য যুদ্ধে নাকি চক্রান্ত করে নিহত করেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এভাবে প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষ হর্ষবর্ধন (রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই) থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ভারতবর্ষকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ শাসনাধীনে আনার প্রয়াস চালান। হর্ষবর্ধন সম্ভবত ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্যকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে গাঙ্গেয় উপত্যকায় তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। কনৌজ তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

হর্ষবর্ধন সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদান

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসে হর্ষবর্ধনই শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট। তাঁর রাজত্বকালকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।তাঁর সম্পর্কে জানার বেশ কিছু উপাদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদিও এই গ্রন্থটিতে হর্ষের রাজত্বকালের সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না, তদুপরি ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং-এর রচনা 'সি-ইউ-কাই' এবং তাঁর জীবনী গ্রন্থ। হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য এই বিবরণে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কেননা ভারত ভ্রমণকালে তিনি হর্ষের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তদুপরি এটিও হর্ষবর্ধনের ইতিহাস জানার একটি অমূল্য উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। হর্ষের রাজত্বকালে খোদিত কয়েকটি লিপিও উপাদান হিসেবে যথেষ্ট মূল্যবান। এগুলোর মধ্যে (১) বাঁশখেরা তাম্রপট্ট; (২) নালন্দা শীখ; (৩) সোনাপৎ তাম্রপট্ট; (৪) মধুবনী তাম্রপট্ট; ও (৫) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি হর্ষবর্ধন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধারণ করে আছে। হর্ষবর্ধন এবং সমকালীন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলোর 'বিশ্বস্ততা' ও 'গুরুত্ব' সবচাইতে বেশি। এছাড়াও প্রাপ্ত কিছু মুদ্রা থেকেও হর্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

হর্ষবর্ধনের কনৌজ অধিকার

সিংহাসনে আরোহণ করেই হর্ষবর্ধন কনৌজ অধিকার করার জন্য অগ্রসর হন। কথিত আছে যে, কনৌজের শূন্য সিংহাসন গ্রহণ করার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কনৌজ দখল করেই তিনি 'হর্ষ সম্বৎ'(৬০৬খ্রি:) প্রচলন করেন। যাহোক, ঐতিহাসিকদের মতে, বিনা বাধায় কনৌজ দখল সম্ভবত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কনৌজ ছিল মৌখরীদের রাজধানী। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের ছোট ভাই শূরসেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। একটি উৎস থেকে অনুমিত হয় শূরসেন সম্ভবত শশাঙ্কের পক্ষে ছিলেন। হর্ষবর্ধন কামরূপের ভাস্কর বর্মণের সাথে মৈত্রী জোট গড়ে তুললে কনৌজের শক্তিসাম্য কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কনৌজের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় এ সময় গৌড়রাজ শশাঙ্ক শূরসেনকে 'তাবেদার রাজা' হিসেবে স্থাপন করে কনৌজ ত্যাগ করেন। এরপর হর্ষবর্ধন সম্ভবত কণৌজ দখল করে নেন। হিউয়েন সাং সূত্রে জানা যায়, রাজ্যশ্রী কনৌজের সিংহাসনে বসতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে কনৌজের মন্ত্রীগণ হর্ষকে রাজ্যটি গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। প্রথমে অনিচ্ছা থাকলেও বোধিসত্তের এ অনুরোধ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কেবল রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যপরিচালনা করেন এবং কিছুকাল পর পরিস্থিতি অনুকূলে বুঝে রাজসদৃশ উপাধি গ্রহণ এবং থানেশ্বর ও কনৌজ যুগ্ম রাজ্যের রাজধানী কনৌজে স্থাপন করেন। তবে হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক, হর্ষবর্ধন যেকোন প্রকারেই কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করুক না কেন তা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তি পুন:স্থাপনে সাহায্য করেছিল।

হর্ষবর্ধনের সামরিক অভিযান

হর্ষবর্ধন 'পৃথিবীব্যাপী' বিজয় অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে তাঁর স্বপক্ষীয় উৎসে উল্লেখ আছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পূর্বদিকে হর্ষবর্ধনের সামরিক সাফল্য সম্পর্কে জানা যায়। চৈনিক সূত্রে বলা হয়েছে, হর্ষ পূর্বদিকে অভিযানে রওনা হয়ে যে-সকল রাজ্য তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে সম্মত হয়নি তাদের বিরুদ্ধে ছয় বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করে 'পঞ্চভারত' নিজ আনুগত্যাধীনে আনেন। তিনি তাঁর ভাই রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারীর ওপর চরম প্রতিশোধ নিয়ে নিজেকে ভারতবর্ষের ওপর প্রভুত্বের আসনে স্থাপন করেন বলেও জানা যায়।

লাট, মালব, গুজরাট, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের সাথে পুষ্যভূতিদের বংশ পরম্পরায় দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। হর্ষের আমলে গুজরাটের বলভী নামক রাজ্যের সাথে যুদ্ধে বলভীর পরাজয় ঘটে, যদিও বলভী বংশ পরে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, বলভী বংশ হর্ষের অনুগত সামন্ত রাজ্য ছিল।

হর্ষবর্ধনের সাথে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সংঘর্ষ সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। হর্ষ যখন উত্তর ভারতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় দক্ষিণে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর তীরে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আপন অধিকার স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন। লাট, মালব, গুর্জর প্রভৃতি রাজ্য পুলকেশীর সামন্ত রাজ্য ছিল বলে জানা যায়। এ কারণে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের কালে রাজ্যগুলো পুলকেশীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। যাহোক, পুলকেশীর লিপি বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয় হর্ষবর্ধন সম্ভবত পরাজিত হয়েছিলেন। তবে পুলকেশীর সাথে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, হর্ষবর্ধন যে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সিন্ধু রাজ্যের বিরুদ্ধেও পুষ্যভূতিদের বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বাণভট্ট উল্লেখ করেছেন যে, হর্ষ 'সিন্ধুর রাজাকে চূর্ণ করিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইয়াছেন'। তবে অন্যান্য উৎস বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয়, সিন্ধুদেশে হর্ষ সাময়িক সাফল্য হয়তো পেয়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই সিন্ধুদেশ তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। হিউয়েন সাং বলেন, হর্ষ কাশ্মিরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানেও সাফল্য অর্জন করেন। কাশ্মিরের রাজা হর্ষের আনুগত্য স্বীকারে এবং তাঁকে বুদ্ধের দেহাবশেষ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

হর্ষের সাম্রাজ্যসীমা

বেশ কিছু উৎসে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ" বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো 'সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি'। কিন্তু বাস্তবে হর্ষ সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বলে জানা যায় না। এমনকি পন্ডিতগণের মধ্যে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বা প্রকৃত সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গেও বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, শ্রাবস্তী, প্রয়াগ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত ছিল। হিউয়েন সাং-এর বিবরণে মগধ ও উড়িষ্যা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে উল্লিখিত আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, হর্ষবর্ধনের সৈন্য সমগ্র উত্তর ভারত পদানত করেছিল। উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত এবং পূর্বে গঞ্জাম হতে পশ্চিমে বলভী পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। ড. কে.এম. পানিক্কর তাঁর 'সার্ভে অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' গ্রন্থে বলেন যে, 'বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরের সকল দেশ, নেপাল ও কাশ্মির হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল'। তবে প্রাপ্ত উৎস এবং সেই উৎসের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ যে সকল মন্তব্য করেছেন তা থেকে হর্ষের রাজ্যের প্রকৃত সীমা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া মন্তব্যগুলোর মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতিও রয়েছে।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব

হর্ষবর্ধন একজন প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন।তাঁর শাসননীতি ছিল স্বৈরাচারের আশ্রয় না নিয়ে, নিজ ক্ষমতায় শাসনকার্য পরিচালনা করা।এইরূপ ব্যবস্থায় সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং জনকল্যাণের আদর্শ ছিল প্রকৃত ভিত্তি।শাসনকার্যে তিনি ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পাশাপাশি সাম্রাজ্যব্যাপী পরিদর্শনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। 'হর্ষবর্ধন ছিলেন অক্লান্ত, এবং তাঁর দিনগুলো কাজের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল'– এই মন্তব্য প্রকাশ করে হিউয়েন সাং হর্ষের কর্মকুশলতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।যাহোক, হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা ছিল দৃশ্যত স্বৈরতন্ত্রী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, একেবারে গ্রামীণ প্রশাসন পর্যন্ত যথেষ্ট স্বায়ত্বশাসনের প্রাধান্য।বলা যেতে পারে, হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচার

(autocracy) ও স্বায়ত্বশাসনের (automony) এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে ভুক্তি (বিভাগ), বিষয় (জেলা), বীথি (উপজেলা বা থানা) এবং গ্রামে ভাগ করা হয়েছিল। তাছাড়া মূল প্রশাসন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক– এই দুই ভাগে ছিল বিভক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার তথা সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রশাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন স্বয়ং। তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য সম্ভবত একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। মন্ত্রীগণ বৈদেশিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণেও ভূমিকা রাখতেন। যেমন শশাঙ্কের সাথে আলোচনার জন্য তাঁর শিবিরে যাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রীপরিষদ রাজ্যবর্ধনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী), মহাবলাধিকৃত (সেনাধ্যক্ষ), অক্ষপটালিক (দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষক), ভোগপতি (রাজস্ব সংগ্রাহক) ইত্যাদি। হর্ষবর্ধনের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। তাঁর বাহিনীতে ৫০ হাজার পদাতিক, ৫ হাজার যুদ্ধহস্তি ও ২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল বলে জানা যায়। সুসংগঠিত সেনা সংগঠনও তিনি গড়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

হর্ষের সময় রাজস্বের হার ছিল খুবই কম। কৃষকেরা তাদের উৎপাদনের এক ষষ্টাংশ রাজস্ব হিসেবে প্রদান করতেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও বাণিজ্য ও খনিশুল্ক ছিল সরকারি আয়ের উৎস। আদায়কৃত রাজস্ব তিনি রাজ্যশাসন ও ধর্মীয় উপাসনা; রাজকর্মচারীদের বেতন ও ভরণ-পোষণ; শিক্ষিতদের মধ্যে বৃত্তি; বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দান; রাস্তাঘাট তৈরি, খাল খনন, বিধবাদের বৃত্তি ইত্যাদি কাজে ব্যয় করতেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে দন্ডবিধি কঠোর ছিল। যাবজ্জীবন কারাদন্ড, নির্বাসন এবং অঙ্গচ্ছেদ ছিল সাধারণ শাস্তি। লঘু অপরাধের জন্য সাধারণত অর্থদন্ড হতো। অনেক সময় অপরাধ নির্ণয়ের জন্য অগ্নি, জল, তুলাদন্ড প্রভৃতি দৈব পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল। দন্ডবিধির কঠোরতা সত্তেও গুপ্তযুগের তুলনায় এ সময় অপরাধ বেশি হতো। অথচ হিউয়েন সাং ভারতীয়দের চরিত্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'ভারতীয়রা অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে না। ..... তারা অপরের পাপের শাস্তি দেখে ভীত হয় এবং তাদের কাজকর্ম ইহলোকে কতখানি ফল দেয় সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। তারা প্রবঞ্চনা করে না এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।'

হর্ষের শাসনব্যবস্থাকে একটি উদারনৈতিক স্বৈরতন্ত্র বলা যেতে পারে। এই শাসনব্যবস্থার সাফল্য হর্ষের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার ওপরই বেশিরভাগ নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য এই ব্যবস্থা গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দক্ষতার সমতুল্য না হলেও অথবা মৌর্য সাম্রাজ্যের বহুমুখী কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে না পারলেও জনসাধারণের নৈতিকতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিচারে তা যথেষ্ট প্রশংসনীয় ছিল।

হর্ষবর্ধন শিক্ষা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নালন্দা বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখনকার অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। সমকালের বিখ্যাত পন্ডিতবর্গ এখানে আলোচনা, বিতর্ক, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষ শিক্ষা, সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তিনি নিজেও একজন প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকার ছিলেন।তাঁর রচিত তিনখানি নাটক বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত হয়েছে।এগুলো হচ্ছে নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা। হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকবি। ময়ূরও কিছুকাল তাঁর সভাকবি ছিলেন।

যাহোক, সামগ্রিকভাবে হর্ষবর্ধনের কৃতিত্বের কথা বলতে গেলে তাঁর ধর্ম সহিষ্ণু নীতি, প্রজাহিতৈষণা, শিক্ষা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সুবিন্যস্ত শাসন কাঠামো এবং সর্বোপরি থানেশ্বরের ক্ষুদ্র রাজ্যকে উত্তর ভারতীয় চরিত্র দানের বিষয় উল্লেখ করতে হবে। ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সাফল্য তাঁর সময়ের এক কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়। তদুপরি খাদ্য, সামাজিক অবস্থা, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হর্ষবর্ধনের আমলে স্থিতি বিদ্যমান ছিল।সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা হিসেবেও হর্ষের কৃতিত্ব সুবিখ্যাত। চালুক্য লিপিতে তাঁকে 'সকলোত্তরপথনাথ' বা সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি বলা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক হর্ষবর্ধনকে 'প্রাচীন ভারতের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শাসক' হিসেবে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক আর.কে. মুখার্জী বলেন, 'হর্ষের চরিত্রে সমুদ্রগুপ্তের সমরকুশলতা ও অশোকের প্রজাহিতৈষণার সমন্বয় ঘটেছিল'।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশের গুরুত্বপুর্ণ শাসক হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ এবং ৬১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্যকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক বিরাট সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। হর্ষবর্ধনের ইতিহাস সম্পর্কে জানার বেশকিছু উৎস রয়েছে। এগুলোর ভিত্তিতে তাঁর কনৌজ অধিকার বা কনৌজের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, অন্যান্য সামরিক অভিযান ও অপরাপর কৃতিত্ব বিষয়ে জানা যায়। বেশ কিছু উৎসে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরের সকল দেশ, নেপাল ও কাশ্মির তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী একজন শাসক। স্বৈরাচার ও স্বায়ত্বশাসনের সমন্বয়ে তাঁর শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আদায়কৃত রাজস্বে হর্ষবর্ধন অনেক জনহিতকর কর্মকান্ড করতেন। হর্ষবর্ধন নিজে একজন কবি ও নাট্যকার এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হর্ষবর্ধনের পিতার নাম–

(ক) গ্রহবর্মণ (খ) প্রভাকরবর্ধন

(গ) রাজ্যবর্ধন (ঘ) রূপবর্ধন।

২। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যসীমা ছিল–

(ক) সমগ্র উত্তর ভারত, নেপাল ও কাশ্মির (খ) সমগ্র ভারত, নেপাল ও কাশ্মির

(গ) সমগ্র দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যা ও বঙ্গ (ঘ) সমগ্র উত্তর ভারত, চালুক্য ও নর্মদা।

৩। 'সকলোত্তরপথনাথ' অর্থকি?

(ক) উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনকারী রাজা (খ) উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেন যিনি

(গ) সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি (ঘ) সমগ্র ভারতের অধিপতি।

৪। হর্ষের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি কি ছিল?

(ক) স্বৈরতান্ত্রিক (খ) গণতান্ত্রিক

(গ) উদারতান্ত্রিক (ঘ) উদার ও স্বৈরতান্ত্রিক।

৫। কোন্ পর্যটক হর্ষবর্ধনের আতিথ্য গ্রহণকরেন?

(ক) হিউয়েন সাং (খ) ইৎ-সিং

(গ) শেংচি (ঘ) ফা-হিয়েন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। হর্ষবর্ধনের পূর্ববর্তী পুষ্যভূতি বংশীয় রাজাদের ওপর একটি টীকা লিখুন।

২। হর্ষবর্ধন সম্পর্কে জানার জন্য সহায়ক ঐতিহাসিক উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।

৩। কনৌজ কিভাবে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়– ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে হর্ষবর্ধনের মূল্যায়ন করুন।

২। উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব নিরূপণ করুন। তাঁকে 'সকলোত্তরপথনাথ' আখ্যাদান কি সঙ্গত?

৩। হর্ষবর্ধনের রাজনৈতিক সাফল্যের বিশেষ উল্লেখপূর্বক তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar and others (ed.), *The History and Culture of Indian People*. Vol-IV, *The Age of Imperial Kanauj.*

২। Devahuti, *Harsavardhana.*

৩। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা।*

৪। হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১ম খন্ড।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (খ) ; ৪। (খ) ; ৫। (ঘ)।
পাঠ : ২ ১। (খ) ; ২। (খ) ; ৩। (গ) ; ৪। (ক)।
পাঠ : ৩ ১। (খ) ; ২। (খ) ; ৩। (ক) ; ৪।(ক) ; ৫। (গ)।
পাঠ : ৪ ১। (খ) ; ২। (ঘ) ; ৩। (গ) ; ৪। (গ)।
পাঠ : ৫ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ক) ; ৬। (গ)।
পাঠ : ৬ ১। (ঘ) ; ২। (গ) ; ৩। (ক) ; ৪। (খ)।
পাঠ : ৭ ১। (গ) ; ২। (খ) ; ৩। (খ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ঘ)।
পাঠ : ৮ ১। (ক) ; ২। (ঘ) ; ৩। (খ) ; ৪। (গ) ; ৫। (ঘ) ; ৬। (গ)।
পাঠ : ৯ ১। (খ) ; ২। (ক) ; ৩। (গ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (গ)।
পাঠ : ১০ ১। (খ) ; ২। (ক) ; ৩। (গ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ক)।